রামমন্দির চিরকালীন
ভারতীয় আদর্শের
প্রতীক — পৃঃ ৫

স্বস্তিকা

দাম : বারো টাকা

৭৩ বর্ষ, ১ সংখ্যা।। ১৭ আগস্ট, ২০২০।।
৩২ শ্রাবণ - ১৪২৭।
যুগাব্দ ৫১২২।।
website : www.eswastika.com

CHOOSE THE BEST

DURO™

LIFETIME GUARANTEE FROM INSECT INFESTATION

TRIPLE HEAT TREATED

DOUBLE CALIBRATED TECHNOLOGY

MADE FROM MATURE AND SUSTAINABLE RAW MATERIAL

LOW EMISSION CONFORMING TO E1 GRADE

The Forest Friendly Company

Duroply Industries Limited

BLOCK BOARD • PLYWOOD • VENEERS • DOORS

113 Park Street, North Block, 4th Floor, Kolkata 700016 | **P:** (033) 2265 2274 | **Toll Free:** 1800 345 3876 (DURO)

Email: corp@duroply.com | **Website:** www.duroply.in | **Find us on** duroplyindia

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ১ সংখ্যা, ৩২ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

১৭ আগস্ট - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৪

রামমন্দির চিরকালীন ভারতীয় আদর্শের প্রতীক
▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ৫

প্রধানমন্ত্রী রামমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে কোনো অসাংবিধানিক কাজ করেননি ▯ পুলকনারায়ণ ধর ▯ ৭

শ্রীরামজন্মভূমি মন্দিরের পুনর্নির্মাণ রাষ্ট্রীয় স্বাভিমানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ▯ করুণা প্রকাশ ▯ ১১

রামমন্দিরের ভূমিপূজা বিরোধী রাজনীতিতে শেষ পেরেক পুঁতে দিল ▯ মণীন্দ্রনাথ সাহা ▯ ১৫

ভারতবর্ষে রামচন্দ্রের বিকাশ ও নবনির্মাণ
▯ ড: অচিন্ত্য বিশ্বাস ▯ ১৮

রামজন্মভূমি অযোধ্যা ছিল সর্বোৎকৃষ্ট মহানগরী
▯ দুর্গাপদ ঘোষ ▯ ২১

অযোধ্যার রামমন্দির হয়ে উঠুক আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রমন্দির
▯ গৌতম কুমার মণ্ডল ▯ ২৪

রামমন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা জাতীয় অস্মিতার পুনর্জাগরণ
▯ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ▯ ২৮

রামমন্দিরের শিলান্যাস ভারতীয় নবজাগরণের সূচনারই প্রকাশ
▯ ড: তুষার কান্তি ঘোষ ▯ ৩১

বনবাসী ভারতের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন
▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ৩৫

কাশ্মীরের ভবিষ্যত ভারতের সঙ্গে একসূত্রে বাঁধা : তার রূপ নির্ধারণের ভার আমাদের হাতে ▯ অভিনব কুমার ▯ ৩৮

সাম্রাজ্যবাদী চীনের সাত শিকার চতুর চীনকে সাত টুকরো করবে ▯ ডা: আর এন দাস ▯ ৪০

অখণ্ড ভারত কোনো অলীক কল্পনা নয়, একটি বাস্তবতা
▯ রুদ্রপ্রসাদ ▯ ৪৩

অনলাইনে শিক্ষার সমস্যা ও সমাধান চিন্তা
▯ বিমল কৃষ্ণ দাস ▯ ৪৫

দেশমাতৃকার চরণে চুরকা মুমুর আত্মবলিদান
▯ দেবব্রত মজুমদার ▯ ৪৬

শেকড়ের সন্ধানে ▯ অজয় সরকার ▯ ৪৭

চিঠিপত্র : ৪৯

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রামমন্দির প্রতিষ্ঠাতেই হিন্দুত্ব আন্দোলন শেষ হইল না

হিন্দুদের পাঁচশত বৎসরের সংগ্রাম একটি পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এই বৎসর আগস্ট মাসের পাঁচ তারিখে। এই দিনটিতে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রামমন্দিরের ভূমিপূজন করিয়াছেন। তাহার মাধ্যমে অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের শুভ সূচনা হইয়াছে। এই দিনটি ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখা রহিবে। বৈদেশিক আগ্রাসনের নির্মম নিদর্শনকে সরাইয়া ভারতীয় ঐতিহ্য ও পরম্পরার পুনরুদ্ধার এই দিনটিতে করা হইয়াছিল— এই কথা প্রতিটি দেশপ্রেমিক ভারতবাসী চিরকাল মনে রাখিবে। অযোধ্যায় যে ভব্য রামমন্দির গড়িয়া উঠিবে, তাহাকে কেবল হিন্দুদের পূজার্চনার স্থানরূপে দেখিলে ভুল হইবে। অযোধ্যার রামমন্দিরকে শুধু হিন্দুদের পূজার্চনার স্থান বলিলে শ্রীরামচন্দ্র ও রামমন্দিরের যে ব্যাপকতা তাহাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রামায়ণকে নিছক একখানি কাব্যগ্রন্থ মনে করেন নাই। তাঁহার মতে, রামায়ণ ভারতবর্ষের ইতিহাস। ইহা নিছক একটি সময় বিশেষের ইতিহাস নহে। ইহা চিরকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাস। এই ইতিহাসে ভিতর ভারতীয় সমাজের আদর্শ ও পরম্পরা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীরাম চরিত্রের মাধ্যমেই এই আদর্শ চরিত্র বর্ণনা করা হইয়াছে। কাজেই রামচন্দ্রকে ভারতীয় আদর্শ ও পরম্পরার প্রতীক হিসাবেই দেখিতে হইবে। কোনো বিশেষ ধর্মবলম্বীদের জন্য নহে, অযোধ্যায় রামমন্দির প্রতিটি ভারতবাসীর আদর্শের প্রতি প্রণত হইবার স্থান।

রামমন্দিরের ভূমিপূজনের সঙ্গে সঙ্গেই অনেকে মনে করিতেছেন, হিন্দুত্ব আন্দোলনের বুঝি পরিসমাপ্তি ঘটিল। মনে রাখিতে হইবে, অযোধ্যায় রামমন্দির প্রতিষ্টা হিন্দুত্ব আন্দোনের অন্যতম লক্ষ্য হইতে পারে, কিন্তু একমাত্র লক্ষ্য নহে। হিন্দুত্ব আন্দোলন চিরপ্রবহমান একটি আন্দোলন। হিন্দুত্ব আন্দোলনের এখনো অনেক পথ চলা বাকি। অযোধ্যায় রামমন্দির প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করা গিয়াছে বটে, কিন্তু কাশী-মথুরায় এখনো বিদেশি আগ্রাসনের কলঙ্কিত নিদর্শন রহিয়াছে। এই রাজ্যের মালদহেই এখনো আদিনাথ মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার স্থলে যে আদিনা মসজিদ গড়িয়া তোলা হইয়াছে, তাহা এখনো বিদ্যমান। কাশী-মথুরা বা আদিনাথ মন্দির পুনরুদ্ধার যতদিন না করা যাইতেছে, ততদিন হিন্দুত্ব আন্দোলন পূর্ণতা লাভ করিবে না। হিন্দুত্ব আন্দোলনের আরও দাবি —দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইন চালু করা। যতক্ষণ দেশে এই আইনগুলি চালু করা না যাইতেছে, ততক্ষণ হিন্দুত্ব আন্দোলনের বিরাম নাই। কাজেই, রামমন্দির স্থাপনার মধ্য দিয়াই হিন্দুত্ব আন্দোলন পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে এমন ভাবিয়া উল্লসিত হইবার কোনো কারণ নাই।

তবে, এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে, অযোধ্যায় রামমন্দির পুনর্নির্মাণ হিন্দু অস্মিতার পুনর্জাগরণ ঘটাইয়াছে। হিন্দুদের মধ্যে যে ব্রহ্মের শক্তি লুক্কায়িত ছিল, তাহাকে জাগ্রত করিয়াছে। ভারতের ঐতিহ্য ও আদর্শকে সদম্ভে বিশ্বের দরবারে পুনরায় উপস্থাপিত করিয়াছে। অযোধ্যায় রামমন্দির চিরকাল হিন্দুদের এই বল ও বীর্যের প্রতীকস্বরূপই বিরাজ করিবে।

সুভাষিতম্

জনিতা চোপনেতা চ যস্তু বিদ্যাং প্রযচ্ছতি।

অন্নদাতা ভয়ত্রাতা পঞ্চৈতা পিতরঃ স্মৃতাঃ।। (চাণক্য নীতি)

জন্মদাতা, উপনয়ন সংস্কার দাতা, বিদ্যাদাতা, অন্নদাতা এবং ভয়ত্রাতা—এই পাঁচজনকে পিতা বলা হয়।

রামমন্দির চিরকালীন ভারতীয় আদর্শের প্রতীক

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

রামায়ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের সমালোচকদের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি মহার্ঘ্য কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন— ''স্তব্ধ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে হইবে সমস্ত ভারতবর্ষ অনেক সহস্র বৎসর ইহাদিগকে কীরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছে। আমি যত বড়ো সমালোচকই হই না কেন, একটি সমগ্র প্রাচীন দেশের ইতিহাস প্রবাহিত সমস্ত কাজের বিচারের নিকট যদি আমার শির নত না হয়, তবে সেই ঔদ্ধত্য লজ্জারই বিষয়।'' রামায়ণ এবং রামচন্দ্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে অপরিসীম শ্রদ্ধা, এই বাক্যে তাই পরিস্ফুট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ রামায়ণকে নিছক একটি এপিক হিসেবে দেখতে চাননি কখনো। বরং রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন, এপিক হিসেবে দেখলে রামায়ণের যে ব্যক্তি তাকেই খর্ব করা হয়। যে কারণে বলছেন, 'আধুনিক কোনো কাব্যের মধ্যেই এমন ব্যাপকতা দেখা যায় না। মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট-এর ভাষার গাম্ভীর্য, ছন্দের মাহাত্ম্য, রসের গভীরতা যতই থাক না কেন, তথাপি তাহা দেশের ধন নহে— তাহা লাইব্রেরির আদরের সামগ্রী।' রামায়ণকে কিন্তু লাইব্রেরির সামগ্রী নয়, দেশের ধন হিসেবে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের কাছে রামায়ণ এক ইতিহাস। এই ইতিহাস কোনো সময় বিশেষের ঘটনাবলীর ইতিহাস নয়। অন্য ইতিহাস কালে কালে কত পরিবর্তন হয়েছে— এ ইতিহাসের কোনো পরিবর্তন হয়নি। এ ইতিহাস চিরকালীন এবং শাশ্বত। কেন? রবীন্দ্রনাথ বলছেন— 'ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প, তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যরহস্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।' বলেছেন, 'মানুষেরই চরম আদর্শ স্থাপনের জন্য ভারতের কবি মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন এবং সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত মানুষের এই আদর্শরচিত বর্ণনা ভারতের পাঠকমণ্ডলী পরমাগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া আসিতেছেন।'

রামায়ণ ভারতের চিরকালীন আদর্শবোধের বর্ণনা করেছে। এবং শ্রীরামচরিত্রের মাধ্যমে এই আদর্শের শিক্ষা দিয়েছে। চিরকালীন আদর্শবোধের কথা বলেছে বলেই রামায়ণ সময় বিশেষের নয়, বরং কালোত্তীর্ণ হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রও মর্যাদাপুরুষোত্তমের আসনে আসীন হয়েছেন এই চিরকালীন শাশ্বত আদর্শবোধকে নিজের জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট করতে পেরেছেন বলেই। শ্রীরামচরিত্র ও রামায়ণ থেকে কী শিক্ষা পেয়েছি আমরা? যদি রামায়ণ কেউ ভালোভাবে অনুধাবন করে থাকেন তো দেখবেন, এক নয়, রামায়ণ ও তার প্রধান চরিত্র আমাদের একাধিক শিক্ষা দিয়েছেন। শ্রীরামচন্দ্র সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষাটি দিয়েছেন, তা হলো জাতীয়তাবোধ। দেশমাতৃকার প্রতি সম্মান এবং ভালোবাসা। অরণ্যে রাক্ষসদের উৎপাত বন্ধ করতে

এবং তাদের দমন করতে কিশোর রাম ও লক্ষ্মণকে ঋষি বিশ্বামিত্র রাজা দশরথের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু সে কি শুধুই রাক্ষসবধের জন্য? তা তো নয়। রামায়ণ পাঠে আমরা দেখতে পাই, এই দেশের সঙ্গে, দেশের ইতিহাসের সঙ্গে, অধিবাসীদের সঙ্গে, সমাজ জীবনের সঙ্গে, রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণকে পরিচয় করিয়ে দেওয়াও উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বামিত্রের। বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণ চলেছেন অরণ্যে। এই যাত্রাপথে বিশ্বামিত্র একের পর এক রাজ্য চেনাচ্ছেন রামকে। সেইসব রাজ্যের ঐতিহ্য, সমাজজীবন, প্রাকৃতিক গড়ন, শস্য, রাষ্ট্রনীতি— সবই উঠে আসছে বিশ্বামিত্রের বর্ণনায়। মুগ্ধ শ্রোতা রাম চিনে নিচ্ছেন এই সুবিশাল ভারতবর্ষকে। তার ফলশ্রুতি কী? লঙ্কা বিজয়ের পর যখন স্বর্ণলঙ্কার রূপে মুগ্ধ লক্ষ্মণ সেখানেই থেকে যেতে চাইছেন, তখনই রামচন্দ্র তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন— 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরিয়সী।' জাতীয়তাবোধের এই মহান বাণী ভারতবর্ষ কেন, আর কোনো দেশের কাব্যেই ধ্বনিত হয়নি।

রামায়ণ সেই অখণ্ড অমৃতপিপাসুদেরই চিরপরিচয় বহন করিতেছে। ইহাতে যে সৌভ্রাত্র, যে সত্যপরায়ণতা, যে পাতিব্রত্য, যে প্রভুভক্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রতি যদি সরল শ্রদ্ধা ও অন্তরের ভক্তি রক্ষা করিতে পারি, তবে আমাদের কারখানা ঘরের বাতায়ন মধ্যে মহাসমুদ্রের নির্মল বায়ু প্রবেশের পথ পাইবে।

রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্র চরিত্রের ভিতর দিয়েই আমরা প্রজাকল্পে নিজের সুখ এবং আনন্দ বিসর্জন দেওয়া এক নৃপতিকে খুঁজে পাই। রামচন্দ্র নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে, কঠিন জীবনযাপন করে, স্ত্রী বিচ্ছেদ সহ্য করে, অশুভকে বিনাশ করে ফিরেছেন অযোধ্যায়। তখন প্রজাপালন তার কাছে মুখ্য কর্তব্য। এই পর্বে অযোধ্যায় তাঁর প্রজারা যখন সীতাদেবী সম্পর্কে সন্দিহান হচ্ছেন, তখন প্রজাকল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রাখতে গিয়ে নিজের সুখ এবং আনন্দকে বিসর্জন দিয়ে স্ত্রী সীতাকে আবার ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন নৃপতি রামচন্দ্র। রামচন্দ্র একজন পরাক্রমশালী নৃপতি হিসেবে প্রজাদের মনোভাবকে গুরুত্ব না দিতেই পারতেন। অবজ্ঞা করতে পারতেন অযোধ্যার প্রজাদের দাবি। কিন্তু তাতে অযোধ্যায় প্রজা বিদ্রোহ হতো। বিনষ্ট হতো অযোধ্যায় সুখ-শান্তি। শ্রীরামচন্দ্রের কাছে তাই নিজ সুখ এবং আনন্দের থেকেও বড়ো হয়েছিল প্রজার কল্প। ভগবান বুদ্ধ আত্মমুক্তি কল্পে স্বীয় স্ত্রীকে ত্যাগ করেছিলেন। রামচন্দ্র স্ত্রীকে ত্যাগ করেছিলেন প্রজাকল্পে। রামায়ণের দৃঢ় সমালোচকরা এটি বুঝতে চান না। কিন্তু নিজের স্ত্রীর প্রতি কি রামচন্দ্রের ভালোবাসা কমে গিয়েছিল কোথাও? একেবারেই না। প্রজাকল্পে স্ত্রীকে ত্যাগ করে মনোকষ্টে দিন কাটিয়েছেন রাজা রাম। সীতার অনুপস্থিতিতে স্বর্ণ সীতামূর্তি প্রতিষ্ঠা করে রাজ্য শাসন করেছেন। সীতার পাতাল প্রবেশের পর সরযূ নদীর জলে আত্মবিসর্জন দিয়েছেন। এক্ষেত্রে রামচন্দ্র এবং তাঁর তিন ভ্রাতার চরিত্রের একটি বিশেষ দিকের প্রতিও দৃষ্টি দিতে হবে। প্রাচীন ভারতে বহু বলবীর্যশালী নৃপতিরই বহুবিবাহ ছিল। বহুগামিতায় অভ্যস্ত ছিলেন তাঁরা। স্বয়ং রাজা দশরথেরও তিনজন স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র এবং তাঁর তিন ভ্রাতা কারোরই বহুবিবাহ ছিল না। কেউই বহুগামিতায় অভ্যস্তও ছিলেন না। রামায়ণের মাধ্যমে শ্রীরামচন্দ্র চরিত্র বৃহত্তর ভারতীয় সমাজগঠনের শিক্ষাটিও দিয়ে গেছেন। বনবাসকালে রামচন্দ্র বনবাসী-গিরিবাসী-মূলনিবাসীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে একাত্ম হচ্ছেন। ভালোবাসা দিয়ে তাদের হৃদয় জয় করেছেন। আশ্রয় গ্রহণ করছেন অরণ্যবাসী রাজা গুহকের, শবরীকে ভালোবাসা উজাড় করে দিচ্ছেন, আবার লঙ্কা অভিযানে তার সঙ্গী হচ্ছেন বনবাসী-গিরিবাসী মূলনিবাসীর। মনে রাখতে হবে, কোনো রাজানুগ্রহ দিয়ে নয়। রামচন্দ্র এদের হৃদয় জয় করছেন ভালোবাসা দিচ্ছেন। উত্তর থেকে দক্ষিণ সমগ্র ভারতকে একসূত্রে গ্রথিত করছেন।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— 'রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়েছে। পিতা-পুত্রে, ভ্রাতায়-ভ্রাতায়, স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতি ভক্তির সম্মান, রামায়ণ তাহাই এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে।' প্রাচীন ভারতীয় সমাজে গার্হস্থ্য আশ্রম অতি উচ্চস্থান অধিকার করেছিল। প্রাচীন ভারতের গার্হস্থ্যাশ্রম অতি উচ্চ স্থান অধিকার করেছিল। প্রাচীন ভারতের গার্হস্থাশ্রমের শিক্ষা দেওয়া হতো। তা কখনই ব্যক্তিগত সুখ ও সুবিধার লক্ষ্যে ছিল না। বরং সমষ্টির সুখ, সমষ্টির কল্যাণ, সমষ্টির সমৃদ্ধি শিক্ষাই সেই গার্হস্থাশ্রমের শিক্ষা ছিল। রামায়ণ সেই আদর্শ গার্হস্থাশ্রমের শিক্ষাই দিয়েছে আমাদের। পিতৃসত্য রক্ষার্থে রামচন্দ্র বনবাসে গিয়েছিলেন। পিতার প্রতিশ্রুতি পুত্রকে রক্ষা করতে হবে কেন— এমন প্রশ্ন তুলে তিনি অযোধ্যার সিংহাসন দখল করেননি। বরং নিঃশর্তভাবে পিতার প্রতি আনুগত্য পালনে এগিয়ে এসেছিলেন। ভ্রাতৃপ্রেমের নিদর্শনও আমরা পাই রামায়ণে। কৈকেয়ী চেয়েছিলেন, রাম বনবাসে গেলে ভরত অযোধ্যার রাজ্যপাটে বসুন। সে সুযোগ ভরতের সামনে ছিলও। তবু ভরত সেই সুযোগ গ্রহণ করেননি। বরং রামচন্দ্র লঙ্কা বিজয় করে ফিরে আসা পর্যন্ত নন্দীগ্রামে রামের পাদুকা সিংহাসনে রেখে রাজ্য পরিচালনা করেছেন ভরত। তেমনই লক্ষ্মণ। রামের অনুগত হয়ে চোদ্দ বছরের অনিশ্চিত বনবাসের জীবন বেছে নেওয়ার কোনো প্রয়োজনই ছিল না তাঁর। তবু নিয়েছিলেন। এবং তা নিছক ভ্রাতৃপ্রেমেরই টানে। এই বনবাসের দিনগুলিতে রামচন্দ্রও কিন্তু পিতার স্নেহে আগলে রেখেছিলেন ভ্রাতা লক্ষ্মণকে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'রামায়ণ সেই অখণ্ড অমৃতপিপাসুদেরই চিরপরিচয় বহন করিতেছে। ইহাতে যে সৌভ্রাত্র, যে সত্যপরায়ণতা, যে পাতিব্রত্য, যে প্রভুভক্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রতি যদি সরল শ্রদ্ধা ও অন্তরের ভক্তি রক্ষা করিতে পারি, তবে আমাদের কারখানা ঘরের বাতায়ন মধ্যে মহাসমুদ্রের নির্মল বায়ু প্রবেশের পথ পাইবে।' রামায়ণে বর্ণিত এই চিরকালীন আদর্শেরই প্রতীক শ্রীরামচন্দ্র। অযোধ্যায় যে রামমন্দির নির্মাণ শুরু হয়েছে, সেই মন্দির নিছক উপাসনাস্থল নয়। সেই রামমন্দির চিরকালীন ভারতীয় আদর্শের প্রতীক।

অযোধ্যায় রামমন্দিরের ভূমিপূজন অনুষ্ঠানে (৫ আগস্ট) বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রধানমন্ত্রী রামমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে কোনো অসাংবিধানিক কাজ করেননি

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ভারতের সংবিধানের সর্বনাশ ঘটিয়েছেন এমন অভিযোগ আজ কেন করছেন? এরা কোনোকালেই ধর্ম কী সে সম্বন্ধে জানতে বা মানতে চাননি। বাস্তবে এরা সংবিধান নয়, অধর্মেরই রক্ষাকবচ। ১৩৫ কোটি ভারতবাসীর এরা কতটুকু অংশ?

পুলকনারায়ণ ধর

গত ৫ আগস্ট ভারতের ইতিহাসে একটি বিরাট ঘটনা ঘটে গেছে। অযোধ্যার রামজন্মভূমিতে রামমন্দির নির্মণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে। এটি হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত দিয়ে। করোনা অতিমারীর আবহে খুব অল্পসংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে কাল ও ক্ষণ বিচার করে শাস্ত্রবিশারদদের নির্দেশ মেনে প্রধানমন্ত্রী রামমন্দিরের শিলা স্থাপন করেছেন। এই ঘটনাটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এরও একটি পূর্বঘটনা আছে। ভারতের মাহামান্য সর্বোচ্চ আদালত ৫ জন বিচারপতি নিয়ে বেঞ্চ গঠন করে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি-সহ ৫ বিচারক সর্বসম্মত ভাবে রায় ঘোষণা করেন যে রামজন্মভূমির জমির অধিকার বর্তাবে রামজন্মভূমি ন্যাসের ওপর। এবং একটি 'ট্রাস্ট' গঠন করা হবে মন্দির নির্মাণের উদ্দেশ্যে। এই ট্রাস্ট গঠিত হবে ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে। সুন্নি মুসলমানদের জন্যও এর বাইরে জমি প্রদান করা হবে।

সুপ্রিম কোর্টের রায় দানকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে ও মুসলমান বিরুদ্ধাবাদীদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু কোনো কিছুই ধোপে টেকেনি। ১৯৪৯ সাল থেকে যে বিতর্কের সূচনা

অযোধ্যায় রামমন্দিরের ভূমিপূজন অনুষ্ঠানে (৫ আগস্ট) গিয়ে রামলালার সামনে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

হয়েছিল এবং যা প্রাক্তনমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সময়ে (১৯৮৫) একটা ভোটকেন্দ্রিক কৌশলীমাত্রা লাভ করেছিল যা বহু দশক ধরে কোনো আদালতই নিষ্পত্তি করতে পারেনি। বলা সঙ্গত কোনো আদালতই (এমনকী সুপ্রিম কোর্টও) তার সাহসিক সমাধানে শব্দ উচ্চারণ করেনি। শেষ পর্যন্ত ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব সমাজ ও নানা দলিল দস্তাবেজ ও আইনের চুলচেরা বিচার করে প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বে ৫ বিচারপতি সর্বসম্মত ভাবে সংবিধান সম্মত ধর্মনিরপেক্ষ রায় ঘোষণা করেছেন। আইনের বিচারে কোনো রায় কোনো ব্যক্তি বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর পক্ষে গেলেও তা মূলত নিরপেক্ষ বলেই গণ্য হবে। কোন গোষ্ঠী এতে আনন্দ অনুভব করবে তা আইনের বিচার্য বিষয় নয়। সত্য কঠিন। সুপ্রিম কোর্ট এই কঠিন সত্যকেই সহজে মেনে নিতে আজ্ঞা দিয়েছিল। প্রতিক্রিয়া যার যেমন। এই রায়েরই অনুবর্তী হিসেবে পরবর্তী বড়ো ঘটনা হলো মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

এক সময় প্রশ্ন উঠেছিল বাবরি মসজিদের নীচে অন্য কোনো ধাঁচা বা মন্দির আছে কিনা। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের পর সে প্রশ্ন মীমাংসিত হয়েছে। ধাঁচা ছিল। সে বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টও তা উল্লেখ করেছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর প্রশ্ন উঠল ওই অবিতর্কিত জমিতে মন্দির না করে কেন হাসপাতাল বা মিউজিয়াম তৈরি করা হবে না। সে দাবিও বুদবুদের মতো মিলিয়ে গেল। এরপর থেকে কোনো জরুরি প্রশ্ন আর ওঠেনি। কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনেরও অবকাশ নেই। রামের নামে মন্দির নির্মাণ হবেই এই অনিবার্যতা বিরুদ্ধবাদীরা বুঝতে পারলেন। যদিও তাঁরা মুসলমান নেতা আসাদুদ্দিন ওয়েসির (এআইএমইন) মতো আজও সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সমালোচনা করেন। সব পথ ও কৌশল রুদ্ধ হলে পর আজ হইচই করছেন 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র রণকৌশল নিয়ে যার তাৎপর্য বাস্তবে শূন্য। এদের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা ও একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জমি বিতর্কের কোনো মীমাংসা না ঘটতে দেওয়া। কারণ তাহলে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে এরা সদাসর্বদা গোলোযোগ সৃষ্টি করতে পারবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে যে-ভাবেই হোক ভারতের ভাবমূর্তিকে বিশ্বের দরবারে খাটো করতে হবে। ডাইনে বাঁয়ে সবসময় শুধু মোদী বিরোধিতা করে যেতে হবে। এই প্রচেষ্টারই অঙ্গ হিসেবে এখন প্রশ্ন তোলা হচ্ছে যে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন্দিরের শিলান্যাস করে সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা লঙ্ঘন করেছেন। যারা এ প্রশ্ন তুলছেন তারা যে সংবিধান বোঝেন না তা নয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে কমিউনিস্ট-নেহরু মার্কা বস্তাপচা ধারণা ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের মনে অহেতুক ভীতি সৃষ্টি করছেন। এ ভাবনাটি বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। আমরা দেখতে চাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শিলন্যাস করে ও রামলালার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে সংবিধান কীভাবে লঙ্ঘন করেছেন এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি

কলুষিত করেছেন।

প্রথমত, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি ও তাঁর সরকার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ও ফর্মূলা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। এ সম্বন্ধে বিরুদ্ধবাদীদের কিছু বলার নেই। যদি থাকত তবে তারা তা নিয়ে এই মুহূর্তেই সুপ্রিম কোর্টে দৌড়াতেন।

দ্বিতীয়ত, যে কোনো ভারতীয় নাগরকিই তার মৌলিক অধিকার চর্চা করতে ও দাবি করতে পারেন। এক্ষেত্রে সংবিধানের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (২৫ থেকে ২৮ নং ধারা) পালন করা আমার- আপনার মতো নরেন্দ্র মোদীরও আছে। ঘটনাক্রমে তিনি আজ দেশের প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলে সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার বর্জন করতে হবে এমন ধারা সংবিধান বা শপথ গ্রহণের ভূর্জপত্রে নেই। সুতরাং তিনি যেখানেই যাবেন প্রধানমন্ত্রীর তকমা তাঁর থাকবেই। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বত্রই তাঁর উপস্থিতি হিসেবেই গণ্য হবে। মন্দির বা হাসপাতাল পরিদর্শনে গেলেও প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীই থাকবেন। ভারতের সংবিধানের কোনো ধারার সঙ্গে এ বিষয়ে কোনো বিরোধ নেই।

তৃতীয়ত, নরেন্দ্র মোদী বিজেপি দলের পক্ষ থেকে নির্বাচনে জয়ী হয়ে প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হয়েছেন। এই বিজেপি দলের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে রামমন্দির নির্মাণের প্রতিশ্রুতি লিপিবদ্ধ আছে। এই প্রতিশ্রুতি কারুর পছন্দ হতে পারে আবার কারুর অপছন্দ হতে পারে। কিন্তু তা নির্বাচন বিধি বা সংবিধান ভঙ্গ করে না। বিজেপির মতে তারা ধর্মনিরপেক্ষতার বিশ্বাস করে, মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার বাতুলতায় নয়। এটা তর্কের বিষয়। কিন্তু তা যদি সংবিধান বিরুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয় তবে তারা নির্বাচনী বিধিভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত হতো। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ভিত্তিতে তাঁর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করলে ধর্মনিরপেক্ষতার কীভাবে সর্বনাশ ঘটল তার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্য নেই। রাজনৈতিক বাগবিস্তার ছাড়া এর কোনো মূল্য নেই।

এ প্রসঙ্গে ইতিহাসের একটি পুরানো ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। ঘটনাটি হচ্ছে— গুজরাটের প্রাচীন সোমনাথ মন্দির প্রসঙ্গ। তুর্কি মুসলমান শাসক মহম্মদ গজনি সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করে বহু কোটি মূল্যের সম্পদ লুণ্ঠন করেছিল। জোতির্লিঙ্গ বিনষ্ট করে হিন্দুমানসে চিরস্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। একবার নয় বহুবার এই মন্দিরের ওপর আক্রমণ ঘটেছে। দেশ স্বাধীন হবার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের উদ্যোগে সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হয়। মন্দির উদ্বোধনে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদকে আহ্বান করা হয়। প্রধানমন্ত্রী নেহরু মন্দির পুনর্নির্মাণের কার্যে বরাবরই সরকারের মন্ত্রী-আমলা ও রাষ্ট্রপতিকে যুক্ত থাকায় আপত্তি জানিয়ে এসেছেন। ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ ২ মার্চ, ১৯৫১ সালে একটি চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে লেখেন যে, মন্দির উদ্বোধনে অংশগ্রহণ করাকে তিনি আপত্তিকর মনে করেন না। তিনি এই অনুষ্ঠানে অবশ্যই যাবেন। প্রধানমন্ত্রী নেহরু প্রত্যেক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের চিঠি দিয়ে এই অনুষ্ঠানে যোগ না দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ অবিচল চিত্তে মন্দিরের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে নেহরুর বিরোধিতা করে বলেছিলেন যে তিনি ভারতের কোনো ঐতিহ্যকে লঙ্ঘন করেননি। মনে রাখতে হবে সে সময় ভারতের সংবিধানে 'সেকুলার' শব্দটিই ছিল না। এই শব্দের স্থাপন ১৯৭৬ সালে ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালে। যাইহোক, মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, এর পরেও ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ আরও বহু বছর (১৯৬২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) রাষ্ট্রপতির পদে ছিলেন এবং ভারতও 'সেকুলার' ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে নরেন্দ্র মোদীর রামমন্দিরের শিলান্যাস কোনো কোনো বুদ্ধিজীবীর অনুমোদন না পেলেও তা 'সেকুলার' সংবিধানের কোন ধারাকে লঙ্ঘন করেছে তার কোনো উত্তর তাদের জানা নেই। কিছুদিন আগেও বেলুড়মঠ রামকৃষ্ণ মিশনে প্রধানমন্ত্রী কেন রাত্রিবাস করেছিলেন সে সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলা হলো কয়েকটি অর্বাচীন প্রাক্তনীদের দ্বারা। আসলে 'সেকুলারইজম' বা রাষ্ট্রীয়তা নয়, মোদী বিরোধিতার জন্যই

দেশ আজ রামময়। দেশ আজ রোমাঞ্চিত। বহুদিনের অপেক্ষার সমাপ্তি। তাঁবুতে বিরাজমান রামলালা এবার মন্দিরে প্রবেশ করবেন। অনেক উত্থান-পতনের পর আজ রামজন্মভূমি মুক্ত। ১৫ আগস্ট দেশ স্বাধীন হয়েছে, ৫ আগস্ট মুক্ত হলো রামমন্দির। রাম আমাদের মনের মধ্যে স্থাপিত। রামের অদ্ভুত শক্তি দেখুন, রামের অস্তিত্ব মিটিয়ে দেওয়ার অনেক চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু রাম আজও আমাদের মনে বাস করেন, তিনি আমাদের সংস্কৃতির ভিত্তি।

— প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

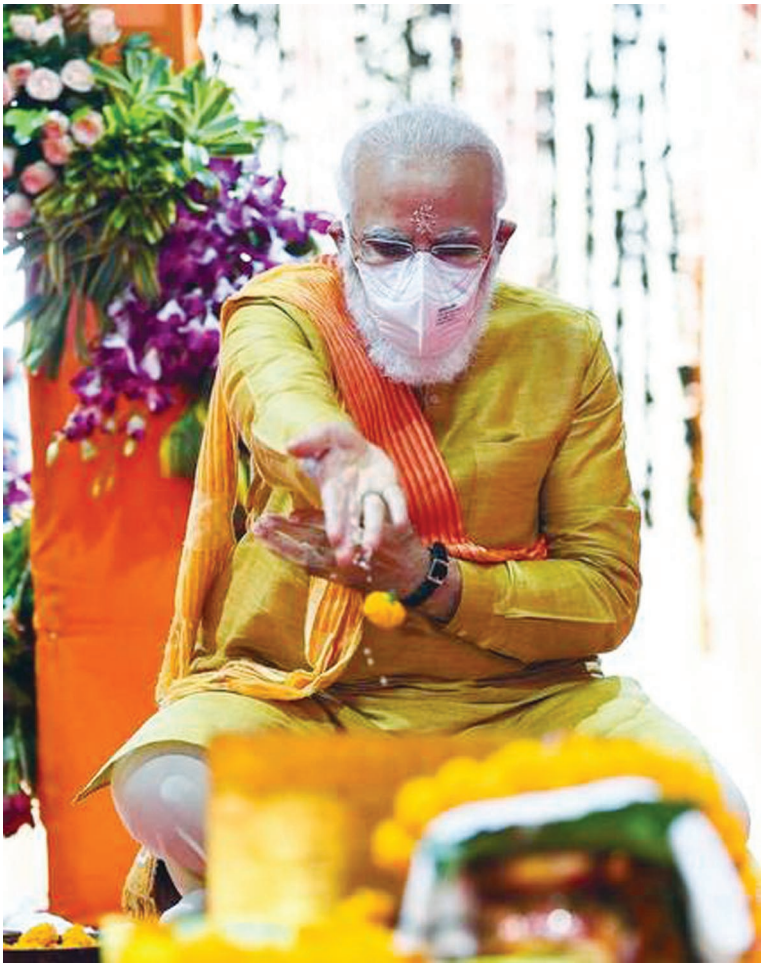

শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থলে ভূমিপূজন করছেন নরেন্দ্র মোদী।

সবকিছু ঘুলিয়ে দেওয়াই কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে কিছু রাজনৈতিক দলের এবং তাদের শাগরেদদের।

এই রাজনৈতিক প্রশ্ন ছেড়ে এবার আবার অন্য একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। ভারতের সংবিধান কতজন বুদ্ধিজীবী পড়েছেন বা অন্ততপক্ষে শুধু চোখে দেখেছেন তা বলা দুরূহ। কিন্তু তাঁদের কেউ কেউ নিশ্চয় জানেন যে মূল হস্তলিখিত সংবিধানে কিছু চিত্র আছে। এই চিত্রগুলিতে সনাতন ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, আদর্শ ও ভাবকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই চিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রাম-সীতা-লক্ষ্মণ, রথারূঢ় অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের চিত্র। আছে বীরভক্ত হনুমানের চিত্র। এই চিত্রগুলি অঙ্কন করেছেন নন্দলাল বসু ও বিশ্বভারতীর কতিপয় ছাত্র। ভারতের সংবিধান কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের নীতি গ্রহণ করেও 'সেকুলার' সংবিধানের মর্যাদা পেয়েছে। সুতরাং নিজের ধর্ম বিশ্বাস ও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কখনই নেতিমূলক ফলের কারণ হতে পারে না। শুধু ভোটের তাগিদে মাথায় ঘোমটা ভাসুর-ভাদ্দর বউয়ের ভড়ং করা আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর। এটা তো আমাদের রাজ্যের নেতা-নেত্রীরাও বোঝেন। যখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে মা-দুর্গার আবরণ উন্মোচন করেন বা খুঁটি পুজোর অনুষ্ঠানে বিধায়ক, সাংসদ বা স্থানীয় পৌর প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকেন পুরোহিতদের সঙ্গে তখন কি ধর্মনিরপেক্ষতার ভাব দূষিত হয়? মাজার বা দরগায় মাথা ঠেকিয়ে কি ধর্মনিরপেক্ষতা ক্ষয়ে যায়? ইফতার পার্টিতে ঘুরে ঘুরে কোন ধর্মনিরপেতার পোষণ করা হয়? অথচ প্রধানমন্ত্রী রামমন্দিরের শিলান্যাস করবেন ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে এই দুশ্চিন্তায় যদি কারও শরীর ও মন বিবশ হয়ে যায় তবে তা সত্যিই চিন্তার বিষয়। কারণ এ ব্যাপারে তো আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার কোনো উপায় নেই। আমরা কি কেউ প্রশ্ন তুলেছিলাম যখন ধর্মনিরপেক্ষ (আদতে ধর্মহীন) জওহরলাল নেহরুর চিতাভস্ম (তাঁরই ইচ্ছায়) কীভাবে সদগতি প্রাপ্ত হয়েছিল? আমরা কি জানতে চেয়েছিলাম প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর গলায় কার আশীর্বাদী রুদ্রাক্ষের মালা শোভিত হতো? না। কারণ এসব অবন্তর ও অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন।

কারণ এতে ধর্মের হানি হয়নি। কিন্তু ভারতবাসীর গভীর ঐতিহ্যের ধারক বাহক রাম ও হনুমান (যাঁদের রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দও বন্দনা করেছেন)-কে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ভারতের সংবিধানের সর্বনাশ ঘটিয়েছেন এমন অভিযোগ আজ কেন করছেন। এরা কোনো কালেই ধর্ম কী সে সম্বন্ধে জানতে বা মানতে চাননি। বাস্তবে এরা সংবিধান নয়, অধর্মেরই রক্ষাকবচ। ১৩৫ কোটি ভারতবাসীর এরা কতটুকু অংশ? ■

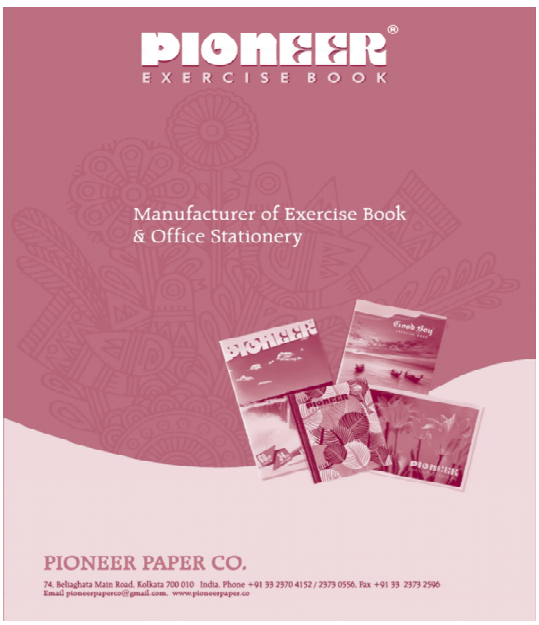

ভূমিপূজন স্থলে প্রণাম জানাচ্ছেন শ্রীমোদী।

শ্রীরামজন্মভূমি মন্দিরের পুনর্নির্মাণ রাষ্ট্রীয় স্বাভিমানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

করুণা প্রকাশ

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যমে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।। —২/৩৬

যদি তুমি যুদ্ধে নিহত হও, তাহলে স্বর্গলাভ করবে আর যদি জয়লাভ করো তাহলে পৃথিবীর রাজত্ব ভোগ করবে। তাই হে অর্জুন! তুমি যুদ্ধের জন্য দৃঢ়নিশ্চয় হয়ে উত্থিত হও।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বৈদেশিক আক্রমণকারী গজনির দ্বারা ধ্বংস হওয়া সোমনাথ (দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ) মন্দিরের পুনর্নির্মাণ তৎকালীন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সংকল্প ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বের কারণে সম্ভব হয়েছিল। যদিও তাঁকে অনেক বিরোধিতার

সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর বিরোধিতা সর্দারজী তোয়াক্কা করেননি। রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ মন্দিরের উদ্ঘাটন করেন। তাঁকেও জওহরলাল নেহরুর বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় যাতে তিনি সোমনাথ মন্দির উদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে না যান। জানা যায়, মন্দির উদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতির পদও তিনি ছাড়তে প্রস্তুত ছিলেন। সোমনাথ মন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাভিমান পুনরুদ্ধারের অঙ্গ ছিল।

দীর্ঘ প্রায় ৫০০ বছর নিরন্তর সংঘর্ষের পর অযোধ্যায় শ্রীরাম জন্মভূমিতে হিন্দু সমাজ বিজয় লাভ করেছে। কেবল হিন্দু সমাজ নয়, কেবল ভারতবর্ষ নয়, সম্পূর্ণ বিশ্বের কাছে এটি একটি অভূতপূর্ব এবং বিস্ময়কর ঘটনা। কোনো রাষ্ট্র কোনো জাতি কতটা স্বাভিমানী হলে এটা সম্ভব হতে পারে।

শ্রীরামজন্মভূমি নিয়ে হিন্দু সমাজ যে লাগাতার সংঘর্ষ করে এসেছে, আপোশহীন লড়াই চালিয়েছে, বিশ্বে এরকম আর কোনো উদাহারণ নেই। রামজন্মভূমির জন্য কোনো প্রকার আপোশ বা সমঝোতা হিন্দু সমাজ কখনও করেনি। ভগবান শ্রীরামের প্রতি হিন্দুর আস্থা-শ্রদ্ধা আবহমানকাল ধরে ভারতীয় জীবনের অঙ্গ — 'সিয়া-রাম ময় সব জগ জানি, করহি প্রণাম জোরী যুগ পানী'। অনেক আক্রমণ, অনেক অত্যাচার যা বিশ্বের ইতিহাসে প্রায় বিরল বলা যায় সে সত্ত্বেও হিন্দুসমাজ তার আরাধ্য প্রভু শ্রীরামকে কখনও ভোলেনি। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর জন্মভূমির উপর বিধর্মীর আধিপত্য হিন্দু কখনও মেনে নেয়নি।

১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে বাবরের আদেশে তার সেনাপতি মীর বাকি যখন শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির ধ্বংস করে তখন অযোধ্যার আপামর হিন্দু সমাজ সর্বশক্তি দিয়ে তাঁদের আরাধ্য প্রভু শ্রীরামের মন্দির রক্ষার জন্য প্রাণপাত সংঘর্ষ করে। মুঘল আক্রমণকারীরা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান হওয়ার ফলে হিন্দু সমাজ অধিক সময় এই প্রতিরোধ বজায় রাখতে পারেনি। কিন্তু পরবর্তীকালে পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে জন্মভূমিকে যুক্ত করার জন্য সব ধরনের প্রচেষ্টা করেছে। অকথ্য অত্যাচার সহ্য করেছে, অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে, অনেক বলিদান দিয়ে জন্মভূমিকে উদ্ধারের চেষ্টা অনবরত চালিয়ে গেছে। কখনও হিন্দুরা জয়লাভ করেছে, কখনও আবার মুসলমান শাসকরা পুনরায় জন্মভূমিকে কবজা করেছে।

বছরের পর বছর, যুগ যুগ ধরে শ্রীরামজন্মভূমিকে মুক্ত করার জন্য হিন্দু রাজা-মহারাজা, ধর্মগুরু, সাধু-সন্ন্যাসীরা তথা দেশের আপামর রামভক্ত এই স্থানটির জন্য সর্বস্ব বলিদানের, পরাক্রমের, আত্মত্যাগের এক উদাহরণ প্রস্তুত করেছে। সেই সময়কার প্রায় সহায় সম্বলহীন হিন্দু সমাজ কীভাবে অত্যাচারী বর্বর মুসলমান শাসকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল তা আজ ইতিহাসকার, চিন্তক , বিদ্বান ও গবেষকদের কাছে এক বিস্ময়ের বিষয়। শত অত্যাচারেও হিন্দুর সেই চেতনা কখনও লুপ্ত হয়নি। যখন সুযোগ পেয়েছে তখনই স্বাভিমানী হিন্দু সমাজ তার হৃতগৌরব ফিরে পাওয়ার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে লড়াই করেছে।

ইসলামি শাসনের অবসানের পর ইংরেজ রাজত্ব শুরু হলে, তখনও জন্মভূমির বিষয়ে তাদেরও নীতির কোনো পরিবর্তন হয়নি। জন্মভূমিকে হিন্দুর হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। হিন্দু সমাজ কিন্তু থেমে থাকেনি। জন্মভূমিকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা দিন প্রতিদিন আরও তীব্র হয়েছে। কোনো এক সময়ে হিন্দু মুসলমান উভয়ই সহমত হলে কূটকৌশলী ইংরেজ তা বানচাল করে বিবাদ জিইয়ে রাখে। শুধু তাই নয়, যারা সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছিল এরকম উভয় পক্ষের কয়েকজনকে ইংরেজ শাসক ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, হিন্দুদের দ্বারা জন্মভূমিকে মুক্ত করার প্রচেষ্টায় ক্ষতিগ্রস্ত ধাঁচা মেরামতের সম্পূর্ণ খরচ ইংরেজ শাসক শাস্তিস্বরূপ হিন্দুদের নিকট হতে জবরদস্তি আদায় করে তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ধাঁচা মেরামত করেছে —এরকম প্রমাণও আছে।

তা সত্ত্বেও হিন্দু সমাজ চুপ করে বসে থাকেনি। ভারতের বিভিন্ন

শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থলে ভূমিপূজনে সকলের সঙ্গে শ্রীনরেন্দ্র মোদী।

বোতাম টিপে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থলে ভূমিপূজনের স্মারকশিলার আবরণ উন্মোচন করছেন নরেন্দ্র মোদী, যোগী আদিত্যনাথ, মহন্ত নিত্যগোপাল দাস। পাশে রয়েছেন মোহন ভাগবত।

প্রান্তে বাসকারী হিন্দু, বিভিন্ন ভাষাভাষী হিন্দু, পৃথক পৃথক গুরু পরম্পরা অনুসরণকারী হিন্দু, বনবাসী-শহরবাসী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, মহিলা-পুরুষ, কবি-সাহিত্যিক-লেখক-শিল্পী কোনো না কোনো সময়ে শ্রীরামজন্মভূমির বিষয়ে সোচ্চার হয়েছেন। হিন্দু যেমন কখনও রামকে ভোলেনি ঠিক সেই রকমই ভগবান শ্রীরামের জন্মস্থানকে মুক্ত করার কথা কখনও ভোলেনি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলে গেছে কিন্তু হিন্দুর ধমনীতে পুরুষানুক্রমে এই অন্যায়-অপমান- কলঙ্ক থেকে মুক্ত হওয়ার চেতনা সদা জাগ্রত থেকেছে। আমাদের দেশের সাধু-সন্ন্যাসীগণ, ধর্মগুরু, মনীষীগণ, রাষ্ট্রনায়কগণের বিশেষ ভূমিকা এ বিষয়ে কখনও অস্বীকার করা যাবে না। জাতির চেতনাকে সদা জাগ্রত (অলখ নিরঞ্জন) রাখার কাজ এই মহান বিভূতিরা করেছেন।

বিশ্বের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা কিছু ব্যতিক্রমী উদাহরণও দেখতে পাই। ইজায়েল থেকে ইহুদিরা যখন বিধর্মীদের দ্বারা পরাভূত হয়ে তাদের নিজভূমি থেকে উৎখাত হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শরণার্থী রূপে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় তখন শত সমস্যার মধ্যেও তারা তাদের নিজ মাতৃভূমি ও ভাষা হিব্রুকে কখনও ভোলেনি। ইজরায়েলকে বিদেশিদের থেকে মুক্ত করার সংকল্প তারা কখনও ভোলেনি। দুনিয়ার যেখানেই তারা থেকেছে সেখান থেকেই তারা আগামী বছর জেরুজালম (ইজরায়েলর রাজধানী)-এ স্বাধীনতা দিবস পালন করার সংকল্প বার বার স্মরণ করেছে। আগামী বছরই তারা জেরুজালম উদ্ধার করতে পারেনি ঠিকই কিন্তু তাদের জাতির স্বাভিমানী চেতনা কখনও লুপ্ত হয়নি যে তাদের দেশ পরাধীন, তারা বিদেশিদের পদানত হয়ে আজ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে শরণার্থী রূপে অবস্থান করতে হচ্ছে। একটি জাতির সেই স্বাভিমানী মানসিকতা দৃঢ় সংকল্পের পরিণাম স্বরূপ আমরা জানি যে প্রায় ২০০০ বছর পর তারা ইজরায়েলকে স্বাধীন করতে সক্ষম হয়েছে। আজ তাদের প্রতিবেশী অনেক শক্তিশালী ইসলামি দেশগুলো ইজায়েলের দিকে বাঁকা চোখে তাকাতে পারে না। ইজরায়েলের মানসিকতার সঙ্গে শ্রীরামজন্মভূমি উদ্ধারে সংকল্পবদ্ধ ভারতবাসীর মিল অনেকটাই।

“আজ সবচেয়ে বড়ো আনন্দের বিষয় হলো, ভারতকে আত্মনির্ভর বানানোর জন্য যে আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন ছিল, যে স্বাভিমানের প্রয়োজন ছিল, তা আজ সগুণ, সাকার অধিষ্ঠান নির্মাণের শুভারম্ভ হচ্ছে। .... অযোধ্যায় ভব্য রামমন্দির নির্মাণ ভারতবর্ষে অন্য লক্ষ লক্ষ মন্দির নির্মাণের মতো কেবল একটি মন্দির নির্মাণ নয়, উপরন্তু দেশের সমস্ত মন্দিরে স্থাপিত মূর্তিগুলির যে তাৎপর্য, তার পুনঃপ্রকটীকরণ এবং তার পুনঃস্থাপন করার শুভারম্ভ আজ এখানে খুবই শক্তিশালী হাতের দ্বারা হলো।”

— মোহনরাও ভাগবত,
সরসঙ্ঘচালক, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির কোনো সামান্য মন্দির নির্মাণের আন্দোলন ছিল না। এটি বাস্তবে রাষ্ট্রমন্দির নির্মাণের আন্দোলন। আমাদের দেশে রাম রাষ্ট্রের কল্পনা আছে। গান্ধীজীও রামরাজ্যের কথা বলেছেন। রামরাজ্য মানে এক আদর্শ রাষ্ট্র যেখানে সমস্ত নাগরিক ন্যায় পাবেন, এক সুশাসন সম্পন্ন এবং শান্তি-শৃঙ্খলা তথা শিক্ষা-সংস্কৃতি-সহ সর্বপ্রকারের উন্নতিসম্পন্ন এক রাষ্ট্র। এ সবকিছু তখনই সম্ভব হবে যখন কোনো জাতি কোনো রাষ্ট্র স্বাভিমানী হবে, আত্ম মর্যাদাসম্পন্ন হবে; নিজ মহাপুরুষ, নিজ ঐতিহ্য, পরম্পরা, সংস্কৃতির প্রতি গর্ববোধ করবে, শ্রদ্ধাবিন্দুগুলির ওপর পূর্ণ আস্থা থাকবে— আর এগুলির মূলে কিন্তু আধ্যাত্মিকতা। যুগ যুগ ধরে ভারতের হিন্দুরা সমাজ জীবনে ধর্মকে ধারণ করে চলেছে। তাই শত অত্যাচারেও হিন্দু নিজ সত্তা কখনও বিসর্জন দেয়নি।

বিদেশি আক্রমণকারী শাসকরা ভেবেছিল কিছু মন্দির ধ্বংস করে, ধর্মগ্রন্থ নষ্ট করে, তীর্থস্থান অপবিত্র করে, ধর্মান্তরিত করে, সর্বত্র এক ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ভারতকেও সম্পূর্ণ ইসলামিক দেশে পরিণত করা সম্ভব হবে। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি, কারণ ভারতের মূলে যে ধর্মচেতনা আর সেখান থেকে রাষ্ট্রচেতনা তা থেকে ভারত কখনও বিচ্যুত হয়নি। ঋষি অরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী রামতীর্থ প্রমুখ মনীষীর জীবনে ধর্মচেতনা ও রাষ্ট্রচেতনা সমার্থক ছিল। যেখানে মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামকে জীবনাদর্শ রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমাজকে পথ দেখিয়েছেন। যেখানে গীতা, রামায়ণ-মহাভারত জীবনের অঙ্গ সেখানে বিজয় নিশ্চিত।

১৫২৮-এ অযোধ্যায় রামজন্মভূমি পুনরুদ্ধারে যে সংঘর্ষ আমাদের পূর্বপুরুষেরা শুরু করেছিলেন তা কিন্তু একদিনের জন্যও থেমে থাকেনি। এ আন্দোলন শুধু অযোধ্যায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভারতের সর্বত্র সকল রাষ্ট্রভক্ত রামভক্তদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। রাম এখানে রাষ্ট্রনায়ক — রাজারাম; তিনি সকল হিন্দুর হৃদয়ের রাজা, তাঁকে মুছে ফেলা যায় না। গোস্বামী তুলসীদাসের জীবনের ঘটনার কথাও আমরা জানি যে, আকবর যখন দরবারে তাঁকে বাদশার সম্মানে নতমস্তক হতে বলে তখন তিনি তুলসীদাস প্রত্যাখান করে বলেন যে আমার তো রাজা শ্রীরাম। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রই হচ্ছেন একমাত্র রাজা, তিনি কেবল তাঁর সামনেই নতমস্তক হন। দুর্দণ্ডপ্রতাপ আকবর বাদশার ভ্রূকুটি কিন্তু তাঁকে নতমস্তক করাতে পারেনি। এই চেতনা, এই স্বাভিমানের কারণেই আজ ৫০০ বছর পর অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমিতে হিন্দুর বিজয় পতাকা উত্তোলিত হলো।

একটি স্বাভিমানী জাতি তার রাষ্ট্রীয় গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আনন্দে উদ্বেলিত। যাঁদের আত্মবলিদান, ত্যাগ, তপস্যায় এ বিজয় সম্ভব হলো জাতি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধাবনত। সমগ্র বিশ্ব এই বিজয় ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকল। ■

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থলে ভূমিপূজনে মন্ত্রপাঠ করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত।

রামমন্দিরের ভূমিপূজা বিরোধী রাজনীতিতে শেষ পেরেক পুঁতে দিল

সরকারি ক্ষমতা হাতে পেয়ে যাঁরা হিন্দুর সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিচ্ছেন তাঁরা যেন মনে রাখেন সমস্ত অশুভ শক্তির অবসান ঘটিয়ে এখানে একদিন রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা হবে।

মণীন্দ্রনাথ সাহা

প্রত্যাশা মতোই সমস্ত ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে নির্ধারিত দিন এবং সময়ে রামমন্দিরের ভূমিপুজো ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হলো। করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাই ৫ আগস্ট ২০২০ তারিখটি ভারতীয় ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। বাবরের আমলে শুরু হওয়া পরাধীনতার গ্লানি ঘুঁচিয়ে অগণিত সাধু-সন্ত ও রামভক্তদের ৫০০ বছরের লড়াইয়ের শেষে ভগবান শ্রীরামের মন্দির তৈরির সূচনা হলো। এর সঙ্গে শুরু হলো মহাকবি বাল্মীকি রচিত রামায়ণের রামেরই বিজয় যাত্রা।

আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুতে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রামের কৃত্তিবাস মুখোপাধ্যায় (ওঝা) ছিলেন মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একজন প্রধান কবি। আনুমানিক ১৪০৩ খ্রিস্টাব্দে বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত রামায়ণের সহজবোধ্য বাংলা পদ্যানুবাদ করেছিলেন তিনি। সেই রামচন্দ্র সম্পর্কে পরবর্তীতে কে কী বলেছেন তা জানতে হলে আমাদের পিছন ফিরে দেখতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ মাদ্রাজে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'এই প্রাচীন বীরযুগের আদর্শপরায়ণতা ও নীতির সাকার মূর্তি — আদর্শ পতি, আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, সর্বোপরি আদর্শ রাজা রামচন্দ্রের চরিত্র অঙ্কন করিয়া মহর্ষি বাল্মীকি আমাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন।'

অন্তত্য ছোটো বয়স থেকেই রামায়ণ ও ভগবান রামচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের জীবনে কবিসত্তায় প্রভাব ফেলেছিল। তারই প্রমাণ আমরা পাই তাঁর কবিতার মাধ্যমে। 'বাবা যদি রামের মতো পাঠান আমায় বনে, যেতে আমি পারি নাকো তুমি ভাবছ মনে?/ কিন্তু আমি পারি যেতে ভয় করিনা তাতে/ লক্ষ্মণ ভাই

যদি আমার থাকত সাথে সাথে।' রামচন্দ্রের প্রভাব আরও পাওয়া যায় কবির 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে, 'ছেলেবেলা' প্রবন্ধে, 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে, গীতিনাট্য 'বাল্মীকি প্রতিভা' বা 'কালমৃগয়া' গ্রন্থে। রবীন্দ্র ভাবনায় সর্বত্র রামায়ণের ছাপ।

কাজি নজরুল ইসলামের একাধিক গানে-কবিতায় উঠে এসেছেন মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র। বিদ্রোহী কবির ভাষায়, 'অবতার শ্রীরামচন্দ্র, যে জানকিপতি/ তারও হলো বনবাস, রাবণ করে দুর্গতি।'

এস ওয়াজেদ আলির বিখ্যাত প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষ'। তাতে তিনি লিখেছেন— 'একজন যুবক মুদি দোকানের কাজের ফাঁকে ফাঁকে তার বৃদ্ধা মাকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠ করে শোনাচ্ছে, সেই যুবকের স্ত্রী তার কোলের ছেলেকে নিয়ে গৃহকার্যের মাঝে এসে পাশে বসে রামায়ণ শুনছে, আবার উঠে যাচ্ছে।' লেখক বহু বছর পর এসে দেখলেন অবিকল সেই দৃশ্য। সেই যুবক মুদি, বৃদ্ধা মা, ছেলে কোলে গৃহবধু আর সেই কৃত্তিবাসী রামায়ণের বইটি পাঠ করা হচ্ছে। লেখক প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। শেষে বুঝলেন, সেদিনের কোলের শিশু আজকের যুবক মুদি, সেদিনের তরুণী বধুই আজকের বৃদ্ধা, 'সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে।'

গান্ধীজী স্বয়ং রামরাজ্যের কথা বলেছেন। তিনি যে বিখ্যাত ভজনটি গাইতেন, তা হলো— 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম, পতিত পাবন সীতারাম। সুন্দর বিগ্রহ মেঘশ্যাম, গঙ্গা তুলসী শালীগ্রাম। ভদ্র গিরিশ্বর সীতারাম, জগ-জনপ্রিয় সীতরাম। জানকী-রমণী সীতরাম, জয় জয় রাঘব সীতারাম।'

শ্রীরাম জন্মভূমি পরিসরে পারিজাত বৃক্ষ রোপণ করছেন শ্রীমোদী। সঙ্গে যোগী আদিত্যনাথ ও দীনেশচন্দ্র।

বর্তমানে বিজেপি বিরোধী রাজনীতিকদের মধ্যে ভয়ে হোক, ভক্তিতে হোক বা রাজনীতির আঙ্গিনায় টিকে থাকার লোভেই হোক রামের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। যেমন, ইতিপূর্বে সিপিএম নেতা সূর্যকান্ত মিশ্র মন্তব্য করেছিলেন, কেরলে আমরা রামগান শুরু করেছি এবং রামসপ্তাহ পালন করা হবে।

অযোধ্যায় রামমন্দিরের শিলান্যাসের আগের দিন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী (বঢড়া) বলেছেন— 'ভূমিপুজো জাতীয় ঐক্যের উৎসব হয়ে উঠুক। সরলতা, সাহস, সংযম, ত্যাগ এবং প্রতিজ্ঞা ছিল দীনবন্ধু রামের মূলকথা। ভগবান শ্রীরাম সবার সঙ্গে রয়েছেন। আশা করি এই ভূমি পুজো জাতীয় ঐক্য ও সংস্কৃতিকে আরও দৃঢ় করবে।'

মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা মধ্যপ্রদেশের বর্তমান কংগ্রেস সভাপতি কমলনাথ সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন— 'মন্দির তৈরির জন্য তারা অযোধ্যায় ১১টি রুপোর ইঁট পাঠাবেন। এছাড়াও সোমবার কংগ্রেসের অন্যান্য নেতা ও কর্মীদের নিয়ে তিনি ভোপালের বাড়িতে অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ উপলক্ষ্যে হনুমান চালিশা পাঠ করেছেন।'

অথচ এ রাজ্যে ইতিপূর্বে শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে যে কাণ্ড ঘটে গেছে তা স্মরণ করতে যেমন লজ্জায় মাথা হেট হয়ে আসে তেমনি ঘৃণা জন্মে। তা হলো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং গাড়ি থেকে নেমে তেড়ে যান শ্রীরামের নামে জয়ধ্বনি দেওয়া যুবকের দিকে। উপরন্তু রকের ভাষা ব্যবহার করেন সেই যুবকের প্রতি, যা মুখ্যমন্ত্রীর পদের সঙ্গে বড়োই বেমানান। তাঁর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ উঠেছে, কোনো

অযোধ্যায় শ্রীরাম জন্মভূমি মন্দিরের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত সন্ত সম্প্রদায়ের একাংশ।

এক সম্প্রদায়কে খুশি করার জন্য তিনি ইচ্ছা করে অযোধ্যায় ভূমিপুজোর দিনকে রাজ্যে লকডাউন ঘোষণা করেছেন। আগস্ট মাসের লকডাউনের দিনগুলি মুসলমানদের সুবিধার্থে চারবার বদল করা হয়েছে। কিন্তু বিজেপি দলের অনুরোধ সত্ত্বেও পাঁচ আগস্ট দিনটিকে লকডাউনের বাইরে রাখা হয়নি। পাঁচ আগস্ট টিভি নিউজে আরও দেখা গেছে মেদিনীপুরে ভগবান শ্রীরামের ছবি সংবলিত ফ্লেক্স কে বা কারা ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে রেখেছে। এ সম্পর্কে কেউ কেউ মন্তব্য করছেন— বিজেপির বিরোধিতা করতে গিয়ে এ রাজ্যে যেভাবে হিন্দু এবং হিন্দুধর্মের বিরোধিতা শুরু হয়েছে তা সম্ভবত মুখ্যমন্ত্রীর অঙ্গুলি হেলনে হতে পারে। যদি সত্যিই তা হয় তাহলে আগামীদিনে মুখ্যমন্ত্রীকে হয়তো বড়োরকমের মূল্য চোকাতে হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ আজ এক চরম অরাজকতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আইনের ক্ষমতাকে বেআইনিভাবে শুধু শান্তিপ্রিয় হিন্দুদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অথচ জেহাদি, দাঙ্গাবাজরা এ রাজ্যে সরকারি প্রশ্রয়ে একের পর এক জেহাদি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তার ফলে আজ এ রাজ্যে হিন্দুর অস্তিত্ব বিপন্ন। স্বাধীনতার পরে এরকম হিন্দু- বিদ্বেষী সরকার এর আগে আর আসেনি। সরকারি ক্ষমতা হাতে পেয়ে যাঁরা হিন্দুর সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিচ্ছেন তাঁরা যেন মনে রাখেন অশুভ শক্তির অবসান ঘটিয়ে এখানে একদিন রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা হবেই হবে। রামমন্দিরের ভূমিপূজা বিরোধী রাজনীতিতে শেষ পেরেক পুঁতে দিল। ■

With Best Compliments from :

PAHARPUR COOLING TOWERS LTD.

PAHARPUR HOUSE

8/1/B, Diamond Harbour Road

Kolkata - 700 027, India

www.paharpur.com

CIN : U02005WB1949PLC018363

Ph. +91-33-4013 3000

Dir. +91-33-4013 3403

Fax : +91-33-4013 3499

vswarup@paharpur.com

ভারতবর্ষে রামচন্দ্রের বিকাশ ও নবনির্মাণ

অনেক ধ্বংস, অন্যায়, আক্রমণ, লুণ্ঠন, ধর্মান্ধতা পার হয়ে এই নির্মাণ-সূচনা একটি গণ-সংগ্রামের পরিণতি। নতুন ভারতের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলো— এরপর তা নব নব নির্মাণের দিকে দুরন্ত গতিতে অগ্রসর হবে। একে প্রতিরোধ করার শক্তি পৃথিবীতে কোনো লুণ্ঠনজীবী রাক্ষসের নেই।

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

'রামায়ণ' নিয়ে বহু মিথ্যা ধারণা প্রচারিত হয়েছে। বঙ্গদেশে রামায়ণ সম্পর্কে নাকি আপত্তি আছে! বাঙ্গালি কৃষ্ণোপাসক। 'কানু ছাড়া গীত নাই'। সম্পূর্ণ ভুল কথা। মহাকবি কত্তিবাস তবে কোন দেশের কবি? শুধু কৃত্তিবাস নন, বাংলা ভাষায় অজস্র কবি রামায়ণ অনুবাদ করেছেন। তাঁদের একটি অসম্পূর্ণ তালিকা দিলাম :

কৃত্তিবাস (পঞ্চদশ শতাব্দী), নিত্যানন্দ, 'অদ্ভুত রামায়ণ' (সপ্তদশ শতাব্দী), শিবানন্দ সেন, ফকিররাম কবিভূষণ, ভবানীশঙ্কর, কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী, জগদরাম রায় (সবাই অষ্টদশ শতাব্দী)। এই পর্যায়ে বিশিষ্ট বঙ্গীয় মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর 'রামায়ণ' (অষ্টাদশ শতাব্দী)। বঙ্গদেশে সংস্কৃত ভাষায় একাধিক কবি রামায়ণ লিখেছেন। অভিকন্দ রচিত 'রামচরিত' (৯ম শতাব্দী), সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' (১০ম শতাব্দীতে) রচিত হয়।

যাঁরা ভাবেন, রামায়ণ উত্তর ভারতীয় আধিপত্যের প্রতীক তাঁদের দুঃখ করার কারণ হতে পারে তথ্যাহরণ করলে। দক্ষিণ

ভারতের চারটি প্রধান ভাষাতে রামায়ণ-কথা অত্যন্ত জনপ্রিয়। সেইসব 'ভাষা রামায়ণ' (অর্থাৎ Nernacnlan Ramayana) উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের আগে থেকেই প্রচলিত হয়েছে। এ থেকে কী প্রমাণিত হয়? দক্ষিণ ভারতে রামায়ণ ও তাঁর নায়ক শ্রীরামচন্দ্র একান্ত আত্মীয়ের মতো। দেখাই—

তালিম : 'কম্বন রামায়ণ'— দশম শতাব্দীর রামায়ণ অনুসারী কাব্য।

কন্নড় : কবি রামচন্দ্র লিখেছিলেন, 'পম্প রামায়ণ' (১১০০ খ্রি.), নরহরি 'কুমাল বাল্মীকি' নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি লিখেছেন কন্নড় রামায়ণ।

তেলুগু : তেলুগু ভাষাতে 'ভাস্কর রামায়ণ' ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত হয়। এর লেখক রঙ্গনাথ।

জোল্লা ছিলেন মহিলা কবি। তাঁর রামায়ণ 'জোল্লা রামায়ণ' অষ্টাদশ শতাব্দীতে অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানা প্রদেশে জনপ্রিয় হয়।

মালায়ালাম : চতুর্দশ শতাব্দীতে 'রামচরিতম্' রচিত হয়— রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের অনুবাদ হিসেবে।

কন্নোগা পানিকর লিখেছেন 'কান্নাগা রামায়ণ' ষোড়শ শতাব্দীতে। এঝুত্তাক্কানের 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'ও মালয়ালাম ভাষার অন্যতম জনপ্রিয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর কবি।

সুতরাং দশম থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে দক্ষিণ ভারতের সমস্ত ভাষায় রামায়ণ-কথা আদৃত ছিল। দক্ষিণ ভারতের রাক্ষস সভ্যতা ধ্বংস করতে শ্রীরামচন্দ্র অভিযান করেছেন— এই মিথ্যা তর্ক বহু পরবর্তী সময়ের। এর সঙ্গে দ্রাবিড়-মনের, সংস্কৃতির সম্পর্ক নেই।

উত্তর ভারতে রামায়ণ-কথা কীভাবে বিভিন্ন ভাষায় রচিত, অনুদিত নব নব রূপ পরিগ্রহ করেছে তা বলার আগে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের কথা লিখছি।

অসমীয়া : শঙ্করদেব ষোড়শ শতাব্দীতে 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ' অনুবাদ করেছিলেন। তিনি 'রাম বিজয়' নাটকও লিখেছিলেন। শঙ্করদেবের শিষ্য মাধবদেবও রামায়ণের অংশবিশেষ ষোড়শ শতাব্দীতে রচনা করেন। এর আগে চতুর্দশ শতাব্দীতে মাধব 'কন্দলী রামায়ণ' অনুবাদ করেছিলেন। একই শতাব্দীতে দুর্গাবর লিখেছিলেন 'গীতি রামায়ণ'।

উড়িয়া : বলরাম দাস লিখেছিলেন 'জগমোহন রামায়ণ'। ষোড়শ শতাব্দীর বিশিষ্ট বৈষ্ণব কবি বলরাম দাসের এই কাব্য 'দণ্ডী রামায়ণ' নামেও পরিচিত। সরলা দাসের 'রামায়ণ' দপ্তদশ শতাব্দীতে জনপ্রিয় হয়।

মৈথিলি : চঙ্গুয়া রচিত মৈথিলী 'রামায়ণ' ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে রচিত হয়।

নেপালি : নেপালি ভাষা রামায়ণের রচয়িতা ভানুভক্ত। তাঁর রামায়ণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত।

পশ্চিম ভারতের দুটি বড়ো ভাষাগোষ্ঠী যথাক্রমে মারাঠী ও গুজরাটি। এই দুই ভাষার রামায়ণ সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন করছি—

মারাঠি : সন্ত কবি একনাথ ষোড়শ শতাব্দীতে লেখেন 'ভাষার্থ রামায়ণ'। এটি একাধিক প্রচলিত রামায়ণ-কথার বিপুল কাব্য। বাল্মীকি রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ ও আনন্দ রামায়ণ— একত্র করেছেন সন্তকবি একনাথ।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে (১৬০৮ খ্রি.) রামদাস অনুবাদ করেছেন রামায়ণ।

সপ্তদশ শতাব্দীতে 'রাম বিজয়' লিখেছেন শ্রীধর। শ্রীধরের 'রাম বিজয়' মহারাষ্ট্রে অত্যন্ত জনপ্রিয়। শ্রীধর মহাভারতের অনুবাদও করেন। এই দুটি গ্রন্থ মহারাষ্ট্রের হিন্দু গৃহস্থের বাড়িতে রক্ষিত থাকে।

গুজরাটি : প্রেমানন্দ সপ্তদশ শতাব্দীতে আর গিরধর অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামায়ণ অনুবাদ করেন গুজরাটিতে। গিরধরের রামায়ণের জনপ্রিয়তা অত্যন্ত বেশি।

উত্তর ভারতে কাশ্মীরি ভাষায় রামায়ণ অনুবাদ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। করেছিলেন দিবাকর প্রকাশ ভট্ট। এই 'রামায়ণ' হর-পার্বতীর কথোপকথনছলে রচিত হয়। সেদিক

রামমন্দিরকে রাষ্ট্রমন্দির বলা অধিক যুক্তিযুক্ত হবে। এটি নির্মাণের অর্থ হলো ভারতের স্বাভিমানের জাগরণ। এই মন্দির দেশের সমস্ত শ্রেণীর মানুষের সমস্যা সমাধানের কেন্দ্র তৈরি হবে। এই মন্দির ভারতের উন্নতিরও সূচক।

— ড. প্রণব পণ্ড্যা
প্রধান, গায়ত্রী পরিবার

থেকে এই রামায়ণ আগম শাস্ত্রের অন্তর্গত। আগম হলো মুণ্ডমাল শব্দ। 'আ'-শিবের মুখ থেকে 'আ' গত; গ-পার্বতীর কানে 'গ'-ত; 'ম'-বিষ্ণুর সম্মত। এই তিন শব্দ মিলিয়ে 'আগম' শব্দ নিষ্পন্ন।

হিন্দি ভাষায় ১৫৭৫-১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে তুলসীদাস 'রামচরিত মানস' রচনা করেন। এই রচনা ভারতের শুধু নয়— পৃথিবীর যেখানেই হিন্দিভাষীরা ছড়িয়ে পড়েছেন, সেখানেই তুলসীদাসের রামায়ণ ও 'হনুমান চল্লিশা' জনপ্রিয়।

আরও বহু ভাষায় রামায়ণ কথা অনুদিত হয়েছে। সেসবই প্রমাণ করছে ভারতবর্ষে শ্রীরামচন্দ্রের প্রভাব যুগে যুগে পড়েছে। এই প্রভাবের তুলনা পৃথিবীর অন্য কোনো সাহিত্যকর্মের নেই। রামকে ঘিরে ভারতবর্ষ জাতীয় জীবনের আদর্শ হিসেবে যা কিছু সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল— তা ঘনীভূত হয়েছে।

রামকথার সঙ্গে বেদের দূরশ্রুত প্রতিধ্বনি পাওয়া গেছে। ঋগ্বেদের বৃত্রাসুরের সঙ্গে ইন্দ্রের দ্বন্দ্ব রামকথায় রাবণের বিরুদ্ধে শ্রীরামচন্দ্রের সংগ্রামের মিল পাওয়া যায়। বৃত্র কৃষিকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় জলস্রোতকে অবরুদ্ধ করেন। সীতা পৃথিবী দুহিতা, পৃথিবীতেই ফিরে যাচ্ছেন। শস্য-সম্পদ হিসেবে এই রূপক রামায়ণে বিধৃত হয়েছে। রাক্ষসরাজ রাবাণও এই শস্য সম্পদকে অবরুদ্ধ করছেন। ঋগ্বেদের কাহিনিতে আছে, অবরুদ্ধ গোসম্পদ রক্ষা করেছেন কুক্কুরী সরমা। রামায়ণে সীতাকে আগলে রেখেছেন সরমা। সুতরাং রামকথাকে যাঁরা বিদেশি কাহিনি বলে মনে করেন তাঁরা ভারতীয় সংস্কৃতিকে ঠিকমতো বোঝেন না।

ক্রমে রাম-কথা থেকে সাংস্কৃতিক উপকরণের উপর গঙ্গা গোদাবরীর পলি পড়েছে। ভারতের সবখানে ছড়িয়ে পড়েছে শ্রীরাম-সীতা- লক্ষ্মণ-হনুমানের পদচ্ছাপ। রামায়ণ শব্দটি এসেছে রামের অয়ন বা পর্যটন থেকে। এই পর্যটনে অহল্যাভূমি পত্র-পুষ্পে ফলে-শস্যে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। এক পর্যায়ে রাম-বলরাম একাকার হয়েছেন। রাম ধনুর্ধর, বলরাম হলধর, সীতা কৃষিক্ষেত্রে হলকর্ষণের চিহ্ন, লক্ষ্মণ কৃষিসম্পদ। রাজা জনকও কৃষিকর্ম করতেন। এইসব রূপকের আবরণ থেকে ক্রমে চরিত্রায়ণের স্তরে বিকশিত হলো রাম-কথা।

দেশ জাতি ক্রমে রাম-কথাকে অবলম্বন করে বিকশিত হতে থাকল। রামের মতো সন্তান, অগ্রজ, স্বামী, প্রেমিক, বন্ধু, সেনাপতি আর কে? বনবাসী রামচন্দ্র স্ত্রী-সম্মানের জন্য অযোধ্যায় ফিরে যাননি— ভরতের সাহায্য নেওয়া তাঁর পণ রক্ষার পিতৃসত্য পালনে অন্তরায় ছিল। এই ভাবে এক মহৎ ব্যক্তিত্ব— Person নয়, Personality রামচন্দ্রকে ঘিরে সন্নিবেশিত হয়েছে। দেশের মানুষ যা চায় রামচন্দ্র তারই সুষমামণ্ডিত রূপায়ণ হলো। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, রামায়ণ ঘরের কথাকে বড়ো করে ধরেছে। মহাভারতে পারিবারিক দ্বন্দ্বের কুটিল জটিল পর্ব ও পর্বান্তর, রামায়ণে পারিবারিক সংহতির শান্ত রূপায়ণ। ফলে যা ছিল আরণ্যক-সমাজ ভেঙে গ্রাম্যজীবন প্রতিষ্ঠার গল্প তাই হয়েছে নীতিসম্মত পরিবার, একান্নবর্তী বর্ধিষ্ণু জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও পরিণতির জীবন মহাকাব্য।

কবীর দাস, মীরা-,সুরদাস, সর্বোপরি তুলসীদাস। এঁদের দোঁহায় ভজনে চৌপাঈতে রাম হলেন ব্রহ্মের প্রতিরূপ। রামনাম করলেই কোটি পাপ থেকে মুক্তির ভাবনা ভারতীয় জীবন-রসায়ণে নতুন অমৃত কণা। কৃত্তিবাসের 'রামপাঁচালী'তে পেলাম সুবাহুর পালা— তরণী সেন বধের পালা। সুবাহু রামভক্ত। রাক্ষসকুলে জন্ম হলেও তাঁর ভক্তিতে রামচন্দ্র কৃপা প্রদান করছেন, এমন ভাব পরিকল্পনা 'রামভক্তিবাদ' প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত বহন করে। তরণী সেন রামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেছেন সারা শরীরে, রথে, রথের চূড়ায় 'রাম নাম' লিখে। মৃত্যুর পরও 'তরণী সেনের মুণ্ড রাম নাম বলে'।

বৌদ্ধ ভাষ্যে রাম-রাবণ যুদ্ধ প্রসঙ্গ অনুপস্থিত। কারও কারও মতে অহিংসা-প্রিয় বৌদ্ধরা এই অংশ পরিহার করেছেন। হিন্দু ভারত কিন্তু মনে করে ঈশ্বর অবতীর্ণ হন ধর্ম রক্ষা ও অধর্ম দূর করার জন্য। ধর্ম রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ অনিবার্য। অধর্মের বিনাশ করতে শ্রীরামচন্দ্র পরাঙ্মুখ নন। ফলে রামচন্দ্র শুধু ভক্তি নয় শক্তিরও প্রতীক।

মহাকাল অনির্দিষ্ট গতিশীল তরঙ্গ ভঙ্গ ভারতবর্ষকে বিশ্ব সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলছে। আজ আমরা দেখছি রামচন্দ্রকে অবলম্বন করে এই নতুন ভারতের নবজন্ম হচ্ছে। ১৫২৮-২৯ খ্রিস্টাব্দে রামের জন্মভূমিতে গড়ে উঠেছিল বাবরের আদেশে সেনাপতি মীর বাঁকির তৈরি ধাঁচাটি। এই মহাকালের মহাবৃত্তে একটি বিন্দুর মতো অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ। ভারত ইতিহাসে ভিক্ষুক বেশী লুটেরারা যত চেষ্টাই করুক বারংবার ভেঙে ফেলা 'সোমনাথ' মন্দিরের মতো সে আবার উঠে আসবে। আসবেই। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বলেছিলেন হুমো পাখির কথা। মাটিতে পড়তে পড়তে যাদের ডিম ফোটে, ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে আবার সূর্যের দিকে উড়ে যায়। সোমনাথ মন্দির উঠে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করেছে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ভস্মাচ্ছাদিত সাধনক্ষেত্র থেকে পুনরুজ্জীবিত হয়। এটাই ভারতের ভবিষ্যৎ।

একই কথা রামজন্মভূমিতে শ্রীরামের ভব্য মন্দির গড়ে ওঠার ইতিহাসে। অনেক ধ্বংস, অন্যায়, আক্রমণ, লুণ্ঠন, ধর্মান্ধতা পার হয়ে এই নির্মাণ-সূচনা একটি গণ-সংগ্রামের পরিণতি। ধ্বংসকে সৃষ্টিতে পরিণত করার অমৃত আমাদের পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত ধন। রামচন্দ্র তাকে রক্ষা করেন— তিনি ভারতের আত্মমর্যাদার প্রকৃত ধারক। নতুন ভারতের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলো— এরপর তা নব নব নির্মাণের দিকে দুরন্ত গতিতে অগ্রসর হবে। একে প্রতিরোধ করার শক্তি পৃথিবীতে কোনো লুণ্ঠনজীবী রাক্ষসের নেই। ■

রামজন্মভূমি অযোধ্যা ছিল সর্বোৎকৃষ্ট মহানগরী

দুর্গাপদ ঘোষ

গত ৫ আগস্ট বেলা ১২-১৫ মিনিটে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী অভিজিৎ মূহূর্তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে অযোধ্যায় রামজন্মভূমি মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে। বাল্মীকি রামায়ণ অনুযায়ী উল্লেখিত এই নক্ষত্রযোগে রামচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল। এদিনের এই সমারোহের ৩১ বছর আগে ১৯৮৯ সালের ৯ নভেম্বর দেবোত্থান একাদশীতে কামেশ্বর চৌপালের হাতে রামন্দিরের শিলান্যাস হয়েছিল। কিন্তু অপরিসীম সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বাধাবিঘ্নে সে এখন অতীতের স্মৃতির অতলে। প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মহাসমারোহে এবারের এই ভূমিপূজন অন্য দিক দিয়েও বেশি মহত্ত্বপূর্ণ। কারণ স্বর্গত অশোক সিঙ্ঘলের নেতৃত্বাধীন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের চেষ্টায় দেশের প্রায় সমস্ত সাধুসন্তকে নিয়ে গঠিত রামজন্মভূমি ন্যাস বাস্তুশাস্ত্রবিদ চন্দ্রকান্তভাই সোমপুরাকে দিয়ে রামজন্মভূমি মন্দিরের যে নকশা প্রস্তুত করিয়েছিলেন এখন তার কিছু পরিবর্ধন করা হয়েছে। যেমন সামগ্রিকভাবে মন্দির পরিসরের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি। আগের নকশায় গর্ভগৃহ ছাড়াও নৃত্যমণ্ডপ, কীর্তন মণ্ডপ-সহ মোট আরও তিনটে মন্দির নির্মাণের কথা ছিল। এখন তার সঙ্গে আরও দুটো মিলে ক্রমপর্যায়ে মোট পাঁচটা মণ্ডপ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগের নকশায় মণ্ডপগুলো তিন তলা হবে ঠিক ছিল। এখন তা পাঁচ তলা করা হচ্ছে। তার ফলে মূল মন্দির বা গর্ভগৃহ মন্দিরের চূড়ার উচ্চতাও আরও ২০ ফুট বৃদ্ধি করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এখন মন্দির হবে ৩৬০ ফুট দৈর্ঘ্য, ২৩৫ ফুট প্রস্থ এবং চূড়ার উচ্চতা হবে ১৬১ ফুট। পুরো মন্দির পরিসরের নামকরণ করা হয়েছে ‘রামজন্মভূমি মন্দির তীর্থ। অর্থাৎ মন্দির ছাড়াও আদতে

তীর্থক্ষেত্রটা হবে রামজন্মভূমি। সেটা যে প্রস্তাবিত মন্দির-সহ সমগ্র অযোধ্যা সেকথা বলা বাহুল্য।

অযোধ্যার মাহাত্ম্য কেবল একটা অতি উন্নত ও প্রাচীন নগর বলেই নয়। স্বয়ং পুরুষোত্তম রামচন্দ্রই তাঁর জন্মভূমি সম্পর্কে সে মর্যাদা ব্যক্ত করে গেছেন। বাল্মীকি রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে লঙ্কা বিজয়ের পর তিনি যখন লক্ষ্মণকে বললেন, 'অপি স্বর্ণময়ী লঙ্কা ন মে রোচতে লক্ষ্মণ। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সি।।' তখনই তিনি সর্বকালীন দেশাত্মবোধের গরিমামণ্ডিত কথা শুনিয়ে দিলেন যে জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গের চাইতেও গরিমাময়ী। সেদিন থেকে অযোধ্যা— যাকে যুদ্ধে জয় করা যায় না তা কেবল যুদ্ধে নয়, সমস্ত দিক দিয়েই জয়ের ঊর্ধ্বে। সুদীর্ঘকাল ধরে বহু কৌশলের পরেও আপামর মানুষের মন থেকে, হৃদয়াবেগ থেকে অযোধ্যাকে কেউ জিতে নিতে পারেনি। অযোধ্যা—নামটা কানে বাজার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের প্রায় সমস্ত প্রান্তের মানুষের মনের পর্দায় ভেসে ওঠে রামচন্দ্র এবং তাঁর জন্মভূমি। মহর্ষি বাল্মীকি তাঁর রচিত রামায়ণের বালকাণ্ডে রামচন্দ্রের ব্যক্তিত্বকে যেমন 'সমুদ্র ইব গাম্ভীর্যে ধৈর্যেন হিমবানিব' বলে ব্যাখ্যায়িত করেছেন সেইসঙ্গে ওই কাণ্ডের প্রথম সর্গের ৫ থেকে ২০ শ্লোকে আখ্যায়িত করেছেন অযোধ্যার বর্ণনাও। এখন যখন সেই রামজন্মভূমি পুনরায় তীর্থের মর্যাদায় ভূষিত হলো তখন সেই অযোধ্যার দিকে একবার ফিরে তাকানো যাক।

অযোধ্যায় শ্রীরামলালাকে প্রদক্ষিণ করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

অযোধ্যা রামজন্মভূমি হলেও এই নগরী স্থাপন করেন রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ তথা বিশ্ববিশ্রুত মনুস্মৃতি গ্রন্থের রচয়িতা রাজা মনু। বালকাণ্ডের ষষ্ঠ শ্লোকে বলা হয়েছে—

'অযোধ্যা নাম নগরী তত্রাসীল্লোক বিশ্রুত।
মনুনা মানবেন্দ্রেণ যা পুরী নির্মিতা স্বয়ম্'।।

রাজা মনুর যে বাস্তব অস্তিত্ব ছিল, তিনি যে একজন ঐতিহাসিক পুরুষ ছিলেন তা আজ বহুভাবে স্বীকৃত ও প্রমাণিত। তাঁর লেখা স্মৃতি সংহিতা ছাড়াও অন্যতম প্রমাণ হলো, খ্যাতনামা পর্যটক এফ আই পার্জিটর-এর লেখা 'Ancient Indian historical tradition' গ্রন্থ। লক্ষণীয়, পার্জিটর 'হিস্টোরিক্যাল' বা ঐতিহাসিক শব্দই ব্যবহার করেছেন। লিখেছেন, 'বৈবস্বত মনুর ৯ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন ইক্ষ্বাকু।' প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারও ইক্ষ্বাকুকে ঐতিহাসিক পুরুষ মান্যতা দিয়ে বলেছেন, এই ইক্ষ্বাকু বিকুক্ষিই হলেন ইক্ষ্বাকু বংশের (সূর্যবংশ) প্রতিষ্ঠাতা। 'The vidic Raj' গ্রন্থের ২৭৬ পৃষ্ঠায় ড. মজুমদার আরও জানিয়েছেন যে, 'রাজা মনু তাঁর সাম্রাজ্যকে ১০ ভাগে ভাগ করেন এবং তার মধ্যভাগের শাসনভার তুলে দেন ইক্ষ্বাকুকে। কালান্তরে সেই অংশের নাম হয় কোশল। সেই কোশলের রাজধানী হলো অযোধ্যা।

অযোধ্যাই যে রামচন্দ্রের জন্মস্থান একথা মূল ভারতীয় ঐতিহাসিকরা ছাড়াও অনেক মুসলমান ঐতিহাসিক এবং লেখকও লিখে গেছেন। যেমন মৌলনা হাকিম সইদ আবদুল হাই (১৯৭২)-এর লেখা 'হিন্দুস্তান-এ-ইসলামি আহদ', মৌলবি আবদুল করিম (১৮৮৫)-এর 'গুমগস্ত-এ-হালত-এ-অযোধ্যা', হাজি মহম্মদ ইবন (১৮৭৮)-এর লেখা 'জিয়া-এ-আখতার', আল্লামা মহম্মদ নাজমু গনি খান (১৮৯৫)-এর 'তেহরিক-এ-অবধ' ইত্যাদি গ্রন্থে পরিষ্কারভাবে অযোধ্যাকে রামচন্দ্রের জন্মস্থান বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। লিপি বিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিক ড. কে বি রমেশ, ড. স্বরাজ প্রকাশ গুপ্তা, ড. ঠাকুর প্রসাদ বর্মা এবং ড. সুধা মাল্য— চারজনেই এক সুরে রায় দিয়েছেন যে অযোধ্যাই হলো রামজন্মস্থান এবং এখানেই (যেখানে রামমন্দির পুনর্নির্মিত হচ্ছে) নির্মিত হয়েছিল সুরম্য রামজন্মভূমি মন্দির। সর্বপ্রথম তা নির্মাণ করেন রামচন্দ্রের পুত্র কুশ। পরে গুপ্তযুগে তার দৃষ্টিনন্দন সংস্কার করেন রাজা বিক্রমাদিত্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বহিরাক্রমণকারী মোগল বাদশাহ বাবরের নির্দেশে ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে সেই মন্দির চূর্ণ করে তার ভগ্নসামগ্রী দিয়ে সেই অর্ধভঙ্গ মন্দিরের ওপরই তথাকথিত বাবরি মসজিদ বানান বাবরের এক সেনাপতি মীর বাকি খাঁ।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পূর্বতন শ্যামদেশ বা বর্তমানে থাইল্যান্ডে কেবল রামচন্দ্রই নন, তাঁর পবিত্র জন্মভূমি অযোধ্যাও এতটাই জনপ্রিয় যে অযোধ্যার অনুসরণে সেদেশে অযুধ্যা (স্থানীয় উচ্চারণে আয়ুথারা) নগরী স্থাপিত হয়েছে। কেবল তাই নয়, সেই অযুধ্যা দু' দুবার সেদেশের রাজধানীর মর্যাদাও লাভ করেছে। একবার ১৩৫০ থেকে ১৪৬৩ (১১৩ বছর) এবং আর একবার ১৪৮৮ থেকে ১৭৬৭ (২৬৯ বছর) খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে অযুধ্যাকে প্রথম রাজধানী করেন রাজা প্রথম রামাতিবোধি। সেদেশে রামাতিবোধি শব্দের অর্থ হলো রামাধিপতি।

মহর্ষি বাল্মীকি রচিত রামায়ণের সূত্র ধরে কেবল ভারতবর্ষেই নয়, বর্তমান থাইল্যান্ডে, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, কম্বোডিয়া, ফিলিপিনস, জাপান, লাওস, ভিয়েতনাম, মায়ানমার (পূর্বতন ব্রহ্মদেশ), শ্রীলঙ্কা-সহ সারা বিশ্বে এ পর্যন্ত নানা শিরোনামে ৬০ খানারও বেশি রামায়ণ রচিত হয়েছে। তার প্রায় সবগুলোতেই রামচন্দ্রের পাশাপাশি তাঁর জন্মভূমি অযোধ্যাও কম-বেশি গুরুত্ব লাভ করেছে। অযোধ্যার পূর্বে তার চাইতে

এই বিশাল এবং অসামান্য মন্দির নির্মিত হলে রামজন্মভূমি অযোধ্যার তীর্থক্ষেত্রের গরিমা তো বটেই, নৈসর্গিক সৌন্দর্যও বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। রামজন্মভূমি মন্দিরের মহিমায় রামতীর্থ অযোধ্যা মহাতীর্থের গরিমামণ্ডিত হবে।

উন্নত নগর সভ্যতার বর্ণনা পাওয়া যায় না। কাশী প্রাচীনতম হলেও তা অধ্যাত্মিক ক্ষেত্র হিসাবে পরিচিত। অযোধ্যা নামের উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় সুপ্রাচীন অথর্ববেদের এক সুক্তে। সেখানে অযোধ্যাকে দেবতাদের পুরী বলা হয়েছে—

'অষ্টচক্রা নবদ্বারা দেবানাং পুরযোধ্যা।
অস্যাং হিরণ্যয়ঃ কোশঃ স্বর্গো জ্যোতিষাবৃতাঃ।।

রামচন্দ্র তো তাকে স্বর্গের চেয়েও গরিয়সি বলে গর্ব প্রকাশ করেছেন। তবে বেদের অঙ্গ থেকে অযোধ্যা নামের পরিচয় ঘটলেও তার স্থানমাহাত্ম্য সম্প্রসারিত হয়েছে রামচন্দ্রের জন্মস্থান বলেই। বাল্মীকি অযোধ্যাকে স্পষ্টভাবেই রামজন্মভূমি বলে জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে নগরীর যে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন তা বস্তুত আজকালকার 'স্মার্ট সিটি'-র সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বলা নিষ্প্রয়োজন, কেবল গগনচুম্বি অট্টালিকার জন্য কোনও নগর বা মহানগরকে এই অভিধা দেওয়া হয় না। আরও অনেক দিক যেমন নগর পরিকল্পনা, প্রযুক্তি ও কারিগরি ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধাদি যেমন জল, আলো, বাতাস, নিকাশি ব্যবস্থা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, অট্টালিকাগুলোতে ওঠা-নামার সুবন্দোবস্ত, সবুজায়ন, রাস্তাঘাট, নগরীতে গমনাগমনকারীদের বিশ্রামাগার ও শৌচালয়, আহারাদির ব্যবস্থা, যাতায়াত বা পরিবহণ, যান নিয়ন্ত্রণ, মানুষের জীবনযাত্রার মান খেলাধুলো, সকাল-বিকাল পদচারণা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন এমনকী রোজগারের সংস্থান এবং বিশেষ করে সব শ্রেণীর নাগরিকের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইত্যাদি পর্যালোচনা করে তবেই স্মার্ট সিটির শিরোপা দেওয়া হয়ে থাকে। এই সমস্ত বিচারে বর্তমানে বিশ্বে প্রথম ৫টা স্মার্ট সিটির এক নম্বরে রয়েছে স্পেনের বার্সিলোনা। দ্বিতীয় আমেরিকার নিউ ইয়র্ক, তৃতীয় ইংল্যান্ডের লন্ডন, চতুর্থ ফ্রান্সের নীস আর পঞ্চম স্থানে রয়েছে এশিয়ার সিঙ্গাপুর।

বাল্মীকি রামায়ণ অনুসারে অযোধ্যার অবস্থান হলো সরযূ নদীর তীরে। নগরীর আয়তন ছিল দৈর্ঘ্য ১২ যোজন এবং প্রস্থে ৩ যোজন (অনেক পণ্ডিতের মতে এক যোজন হলো ১২ মাইল বা প্রায় ১৮.৫ কিলোমিটার)। উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকা কোশল প্রদেশের রাজধানী।

'কোশল নাম মুদিতঃ জনপদ স্ফীতো মহান।
নিবিষ্ট সরযূতীরে প্রভুত ধনধ্যন্যবান।।
আয়তন— 'অযোধ্যা দশ চ দ্বে চ যোজনানি মহাপুরী।
শ্রীমতী ত্রীণি বিস্তীর্ণা সুবিভক্ত মহাপথা।।'

এইসব বর্ণনা থেকে জানা যায় রামজন্মভূমির অধিবাসীরা ছিলেন সম্পন্ন, সর্বদা সুখী ও সদাপ্রসন্ন। অযোধ্যা ছিল সর্বদা ধনধান্যে ভরা। তখন তিন লোকের মধ্যে অযোধ্যা ছিল সর্বোৎকৃষ্ট নগরী যাকে মহাপুরী বা মহানগরী বলা হয়েছে। বাল্মীকির বর্ণনায় আরও প্রতীত হয় যে অযোধ্যা মহাপুরী ছিল অতি সুন্দর, সাজানো-গোছানো, ঝকঝকে-তকতকে, লম্বা-চওড়া এবং আজকালকার মতো ডিভাইডার এবং মাঝে মাঝে বাইপাস সংসযুক্ত রাজমার্গ বা সড়ক সমৃদ্ধ। অর্থাৎ রাস্তার বিভাজন ছিল সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত। সেইসব পথঘাট প্রতিদিন নিয়মিতভাবে জল দিয়ে ধোওয়া হতো।

'রাজমার্গেন মহতা সুবিভক্তেণ শোভিতা।
মুক্তপুষ্পাবকীর্ণের জলসিক্তেন নিত্যশঃ।।

বাল্মীকির বর্ণনায় আরও জানা যায় যে, প্রশাসনিক ব্যবস্থা সুচারু রাখার জন্য অযোধ্যাকে অষ্টচক্রে বা ৮ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। নগরীর মধ্যে প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য প্রধান তোরণ ছাড়াও আরও ৮টা দ্বার (অষ্টচক্রা নবদ্বারা) ছিল। সেগুলো তো বটেই, নগরীর মধ্যেও সর্বত্র আদ্যান্ত আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল। এমনকী কুশল কারিগরদের তৈরি নানা ধরনের যন্ত্রপাতি এবং সশস্ত্র পাহারার বন্দোবস্ত ছিল।

'কপাটতোরণংবতীং সুবিভক্তান্তরাপণাম্।
সর্বযন্ত্রায়ুধতীমুপেতাং সর্বশিল্পীভিঃ।।'

আরও যেসব বর্ণনা রয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, অযোধ্যায় সুউচ্চ অনেক অট্টালিকা ছিল যাদের শীর্ষে সূর্য চিহ্নিত গৈরিক পতাকা শোভা পেত। স্থানে স্থানে নির্মিত ছিল দৃষ্টিনন্দন ও মনোরম উদ্যান। সর্বসাধারণের জন্য নগরীতে অনেকগুলো কূপ খনন করা ছিল যা থেকে সবাই সুপেয় জল পেতেন। বিনোদন ব্যবস্থা ছিল এত উন্নত যে এমনকী মহিলাদের জন্য ছিল পৃথক নাট্যশালাও। বলাবাহুল্য, লঙ্কা বিজয় করে সীতা উদ্ধারের পর রামচন্দ্র যেদিন অযোধ্যায় ফিরে আসেন সেদিন তাঁদের স্বাগত জানানোর জন্য অযোধ্যাকে দীপালোকে সাজানো হয়েছিল। সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে দীপাবলী উৎসব যা এখনও স্বমহিমায় উদ্‌যাপিত হয়ে চলেছে। অতঃপর এই বিশাল এবং অসামান্য মন্দির নির্মিত হলে রামজন্মভূমি অযোধ্যার তীর্থক্ষেত্রের গরিমা তো বটেই, নৈসর্গিক সৌন্দর্যও যে বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রামজন্মভূমি মন্দিরের মহিমায় রামতীর্থ অযোধ্যা মহাতীর্থের গরিমামণ্ডিত হবে।

অযোধ্যার রামমন্দির হয়ে উঠুক আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রমন্দির

রাম যেমন গোটা ভারতের বিবিধতার মধ্যে একতার প্রতীক, তেমনি তাঁর মন্দির হয়ে উঠবে আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রমন্দির। এই মন্দিরের দ্বার চিরদিন সবার জন্য খোলা থাকবে। সব ধর্ম সব সম্প্রদায়ের মিলন মন্দির হয়ে উঠবে অযোধ্যার রামমন্দির।

গৌতম কুমার মণ্ডল

শুধু আমাদের দেশেরই নয়, সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হিন্দু সমাজের বড়ো প্রিয়, বড়ো পবিত্র একটি জায়গার নাম অযোধ্যা। সরযূনদীর তীরে এই প্রাচীন নগরীতেই একসময় রাজা রামচন্দ্র বিরাজ করতেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। তাই আমাদের তীর্থভূমি অযোধ্যা। এ দেশের হিন্দুসমাজের কাছে রামচন্দ্র শুধু শ্রেষ্ঠ রাজাই নন, তিনি ভগবান। তিনি প্রজাহিতৈষী রাজা, তিনি শ্রেষ্ঠ পতি, শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, শ্রেষ্ঠ পুত্র, শ্রেষ্ঠ ভক্তবৎসল। রামচন্দ্রের কাহিনিই তো আমাদের প্রাচীনতম মহাকাব্য রামায়ণ। রবীন্দ্রনাথ আমাদের জানিয়েছেন, রামায়ণ রামচন্দ্রের রাবণের উপর বিজয়ের কাহিনিই নয়, তা আমাদের গৃহজীবনের শ্রেষ্ঠত্বের কাব্য। রামায়ণ মহাকাব্যকে কেন্দ্র করে আমাদের গৃহ এবং পরিবার-কেন্দ্রিক ভারতসংস্কৃতি আবহমানকাল ধরে তার গৌরব ধরে রেখেছে। এই চলিষ্ণু ও জয়িষ্ণু ভারতসংস্কৃতির মূলকথা রামচন্দ্র। কিন্তু আমাদের এমন দুর্ভাগ্য যে রামের জন্মস্থানের মন্দির পুনরুদ্ধার করতেও হিন্দুসমাজকে শতকের পর শতক ধরে অপেক্ষা করতে হলো, দশকের পর দশক ধরে আইনি লড়াই লড়তে

অযোধ্যায় শ্রীরাম জন্মভূমি মন্দিরের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত বক্তব্য রাখছেন।

হলো। এই লড়াইয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলে গেল, বহুজন প্রাণ বলিদান হলো, বহু রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলন হলো। অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের এক সুচিন্তিত রায়ে প্রশস্ত হলো রামমন্দির নির্মাণের পথ। গত ৫ আগস্ট এই মন্দির নির্মাণের কাজ ভিত্তিপুজোর মাধ্যমে শুভ সূচনা করলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রতিটি ভারতবাসীর কাছে তাই ২০২০ সালের ৫ আগস্ট একটি পবিত্র দিন হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রামমন্দির নির্মাণ নয়, রামমন্দির পুনর্নির্মাণ। আগে সে মন্দির ছিলই। এ তো ঐতিহাসিক সত্য। বাবরের সেনাপতি মীর বাকি তা ধ্বংস করে বাবরের নামাঙ্কিত মসজিদ বানিয়েছিল। মধ্যযুগে বহুমন্দির অত্যাচারী মুসলমান শাসকেরা লুঠ করেছে, ধ্বংস করেছে। ধ্বংসস্থলে নির্মিত হয়েছে মসজিদ। সেটা হয়তো তাদের ধর্মেরই অঙ্গ । কিন্তু সেই তিক্ত ইতিহাসের কথা এখন আর না বলাই ভালো। এখন সামনে এগিয়ে যাবার সময়, ভেদাভেদ ভুলে যাবার সময়। আমাদের মনে রাখা দরকার, এ দেশের মুসলমান সংগঠন মন্দির নির্মাণে অর্থসাহায্যও করেছেন বলে শুনেছি। তবে দু'একজন মুসলমান রাজনৈতিক নেতা বিষয়টিকে তো সহজে মেনে নিতে পারছেন না। কারণ তাঁদের রাজনীতির মূল কথাই হলো বিদ্বেষ। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ধর্মকে নিয়েই যাঁরা রাজনীতি করেন, নির্বাচনের জন্যই যাঁরা মন্দির, মসজিদ, গির্জায় ছুটোছুটি করেন আর বিভিন্ন ভেক ধারণ করেন, তাঁদের রাজনীতি বন্ধ করে দওয়া উচিত। ধর্মকে নিয়ে যাঁরা রাজনীতি করেন তাঁরা ভেবে পাচ্ছেন না এখন কোথাও কোনো নির্বাচন নেই, তাহলেও প্রধানমন্ত্রী রামমন্দির নির্মাণের ভিত্তিপুজোয় এলেন কেন? কেনই বা উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকার এই করোনার সংকটকালে মন্দির নির্মাণের রাজসূয় যজ্ঞ করলেন? আসলে তথাকথিত রাজনীতিবিদেরা সবকিছুকেই ভোটের নিক্তিতে বিচার করেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে গিয়েছেন সময় অনেকদূর এগিয়ে গেছে। এদেশের যুব সমাজের ও সাধারণ মানুষের চিন্তাভাবনা আর আগের মতো নেই। একান্তই ভোটকেন্দ্রিক রাজনীতি এখন আর চলছে না।

পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবী সমাজের ভাবনা কী রামমন্দির প্রসঙ্গে? এই বুদ্ধিজীবী সুশীল সমাজ মনে করেন রামমন্দির নির্মাণ করে কী হবে? কী লাভ তাতে? কমিউনিস্টরা বলেন রামের জন্য নয়, মন্দিরের জন্য নয়, আসল লড়াইটা হলো ভাত-কাপড়ের লড়াই। তাঁরা নাকি সেই লড়াই-ই লড়ছেন। বাম বুদ্ধিজীবী সমাজের মূল সন্দেহ রামচন্দ্র বলে কেউ কোনোদিন ছিলেন কি না সে নিয়েই। তাঁদের কাছে মানুষের কয়েক হাজার বছরের ভক্তি ও বিশ্বাসের কোনো মূল্য নেই। তাই এ রাজ্যের সুশীল সমাজ সুযোগ পেলেই ভুলিয়ে দিতে চান যে রাম বলে কেউ কোনোদিন ছিলেন। এমনকী কচিকাঁচাদের মনেও রাম কেন্দ্রিক ধারণাটিকে নিজেদের মনের মতো করে তাঁরা গড়ে তুলতে চান। রাম এই নামটিকে কতদূর কষ্টকল্পনা করে ইংরেজি রোম শব্দের সঙ্গে মেলানো যায় এবং অতীতে যাঁরা ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন তারা সবাই যে রাম — এ ধরনের অবান্তর কল্পনা করা যায় তা পেতে পারি এ রাজ্যের ষষ্ঠ শ্রেণীর ইতিহাস পুস্তকে। আমরা তো জানি

আমি ১৯৯০ থেকে রামমন্দির আন্দোলনে যুক্ত আছি। বহুবার মনে সন্দেহের উদয় হয়েছে যে, রামমন্দির নির্মাণ দেখে যেতে পারব কি না, কিন্তু আজ ভগবানের কৃপায় সেই স্বপ্ন সাকার হতে চলেছে।

— কিশোর কুণাল
প্রতিষ্ঠাতা, মহাবীর মন্দির,
পাটনা

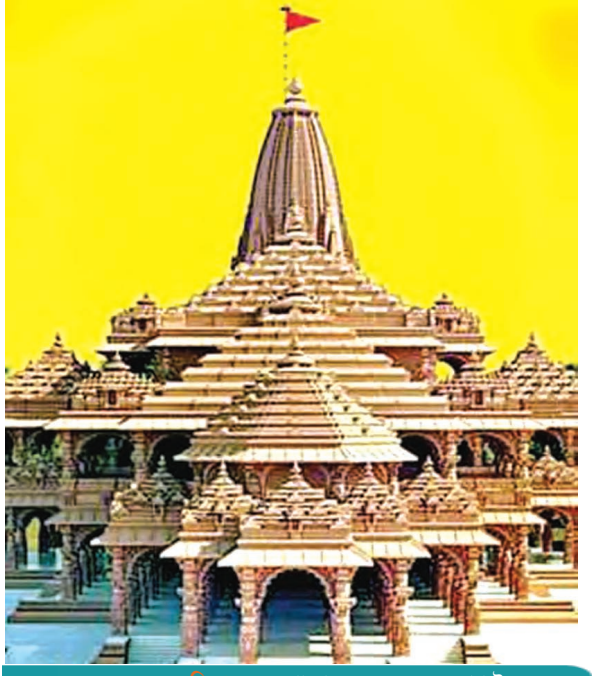

আরও অনেক বই থেকে রাম নামকেই তুলে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। নইলে রামধনু কোনোদিন রংধনু হয়! এসব কৃতিত্ব এ রাজ্যের তথাকথিত বিদ্বজ্জনদেরই। এ রাজ্যের মানুষের মধ্যে এমন ধারণা তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে যে রাম অবাঙ্গালিদের উপাস্য দেবতা।

বাঙ্গালি রীতিনীতির সঙ্গে রাম-ভাবনার কোনো মিল নেই বলে আমাদের শেখানো হয়েছে। রাম ও সীতা যেন একান্তই বহিরাগত। কবি কৃত্তিবাস যেন বিরাট এক ভুল করে রামায়ণের বাংলা অনুবাদ করে ফেলেছিলেন! সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য'তে দেখিয়েছেন দীনেশচন্দ্র সেন কেন সীতাকে 'ঘাঘরাপরা বিদেশিনী' এই আখ্যা দান করিয়া, বাঙ্গলার হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিতে চাহেন।' 'রামায়ণী কথা'র লেখক এভাবে সীতাকে দেখিয়েছেন তাঁর প্রিয় এবং প্রচারিত পল্লীগাথার নায়িকাদের প্রতি পক্ষপাত দেখানোর জন্য। অন্য কোনো কারণে নয়। সেই কবে কৃত্তিবাস আর্য রমণী সীতাকে বাঙ্গালির ঘরের বধূ করে দিয়েছেন তবু কেন আমরা এখনো রাম নামে বহিরাগতের গন্ধ খুঁজব? ভারত সংস্কৃতির মূলকথা রামচন্দ্র এটা এ রাজ্যের বুদ্ধিজীবীরা যত দ্রুত বোঝেন ততই মঙ্গল। ভারত সংস্কৃতিকে বাদ দিলে বাঙ্গালির সংস্কৃতি বলে যে কিছু থাকে না তা সুনীতিকুমারের মতো পণ্ডিতেরা আমাদের বহু আগেই জানিয়ে দিয়ে গেছেন।

গত ৫ আগস্ট রামমন্দিরের ভিত্তিপুজোর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ভাবে নির্মাণকাজ শুরু করে প্রধানমন্ত্রী খুব মর্মস্পর্শী একটি বক্তব্য রেখেছেন। মঞ্চে ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপাল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত ও রামমন্দির পুনরুদ্ধার আন্দোলনের আজীবন সংগ্রামী স্বামী নিত্যগোপাল দাস। মঞ্চের নীচে শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন সারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা এ দেশের ৩৬ টি সাধক পরম্পরার ১৪০ জন সাধু-সন্ত। দূরদর্শনের সম্প্রচারে সারা ভারত এই অনুষ্ঠান ও পুজোপাঠ দেখেছে। পুজোপাঠের পর অনুষ্ঠানে শেষ বক্তা ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী সুবক্তা সবাই জানেন। কিন্তু তিনি যে সাজ-সজ্জা-শৌখিনতাতেও দেশের এক নম্বর ব্রান্ড তা আমরা অনেক সময়ই ভুলে যাই। এদিনের অনুষ্ঠানে তিনি এলেন সাদা ধুতি, হালকা সোনালি রঙের পাঞ্জাবি এবং মানানসই গেরুয়া উত্তরীয় পরে। শ্বেতশুভ্র লম্বা কুঞ্চিত কেশ আর দীর্ঘদিনের বেড়ে ওঠা দাড়ি-গোঁফে তাঁকে মনে হচ্ছিল যেন কোনো ঋষিপুরুষ। বয়স তাঁর সত্তর ছুঁই ছুঁই অথচ চোখ মুখ থেকে বেরিয়ে আসছিল যেন দিব্য বিভা। এই মন্দির কী ও কেন — প্রধানমন্ত্রী তা যেমন বোঝালেন তেমনি শুধু ভারতই নয়, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতেও রাম ও রামায়ণের প্রভাব কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত তা আমাদের আর একবার জানিয়ে দিলেন। মন্দির প্রসঙ্গে 'আধুনিক' কথাটির উপর বেশি জোর দিলেন। রামচন্দ্রের ভাবনা, তাঁর প্রজাহিতৈষী চিন্তা, জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা সব কিছুকে ছুঁয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী। নিয়ে এলেন গান্ধীর 'রামরাজ্য' কথাটির প্রসঙ্গ। সবকিছু মিলিয়ে প্রধানমন্ত্রীর এদিনের বক্তব্য আমাদের শোনা তাঁর সেরা বক্তব্যগুলির একটি।

কিন্তু সমালোচনা তো করতেই হবে। তাই সন্ধ্যায় আমাদের রাজ্যের চ্যানেলে চ্যানেলে চলল সেই বক্তব্যের কাটাছেঁড়া। প্রধানমন্ত্রী নাকি ৫ আগস্টকে ১৫ আগস্টের সঙ্গে তুলনা করে রামমন্দির নির্মাণকেও দ্বিতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ বলেছেন। কিন্তু তিনি তা বলেননি। তিনি যা বলেছেন তার মূল কথা হলো ১৫ আগস্ট যেমন অনেক মানুষের, স্বাধীনতা সংগ্রামীর ত্যাগ ও বলিদানের প্রতীক, তেমন ৫ আগস্টও হলো অনেক মানুষের শতকের পর শতকের লড়াই ও আত্মবলিদানের প্রতীক। দুটি দিন দু'রকমের সংগ্রামের পর সফলতার দুটি প্রতীক। এই কথায় ভুল কিছু নেই। তিনি কখনোই মন্দির নির্মাণকে স্বাধীনতার দ্বিতীয় লড়াই বলেননি। কিন্তু না বললেও তর্ক

করতে অসুবিধা কোথায়? বাংলা নিউজ চ্যানেলের সান্ধ্য আসরগুলি ধারে ও ভারে দিন দিন বড়ো দুর্বল অসার হয়ে উঠছে। মনে হয় মানুষ এগুলি আর দেখেন না, এঁদের কথা আর শোনেন না।

রাম যেমন গোটা ভারতের বিবিধতার মধ্যে একতার প্রতীক, তেমনি তাঁর মন্দির হয়ে উঠুক আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রমন্দির। আমরা চাইব এই মন্দিরের দ্বার চিরদিন সবার জন্য খোলা থাকুক। কোনো সংকীর্ণতাকে এই মন্দির যেন প্রশ্রয় না দেয়। সব ধর্ম সব সম্প্রদায়ের মিলন মন্দির হয়ে উঠুক অযোধ্যার রামমন্দির। অতীতে এক একটি মন্দির রাজার দ্বারা রাজকোষের অর্থে গড়ে উঠেছে। এই আধুনিক ভারতের মন্দির রাজকোষের অর্থে নির্মিত হবে না। জনগণের দানে নির্মিত হবে। আমরা জানি মন্দির নির্মাণ ট্রাস্ট মন্দির নির্মাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত। এও জানি মন্দির নির্মাণের জন্য দেশ-বিদেশের বহু মানুষ ও সংগঠন ধর্মমত ও বিশ্বাস নির্বিশেষে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ১৯৮৯ সালে শিলাপুজোর সময় দেশের কয়েক কোটি সাধারণ, দরিদ্র মানুষ মন্দির নির্মাণকল্পে মাথাপিছু ১ টাকা দিয়েছেন। সবার উদ্যোগে, সাহায্যে, সবার পরশ নিয়ে রামমন্দিরের পুনর্নির্মাণ হতে চলেছে।

অযোধ্যার রামমন্দির হবে ভব্য, সুন্দর, বৃহৎ। মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে সংগ্রহশালা, গবেষণাগার, প্রেক্ষাগৃহ, অতিথিভবন, থাকবে সবুজের সমারোহ, থাকবে জল ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা সবকিছুই। এই অতি প্রাচীন নগরীতে মন্দিরকে কেন্দ্র করেই সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পুণ্য অর্জন ও পর্যটনের কারণে বহু মানুষ এখানে আসবেন। এলাকার অর্থনীতিতে জোয়ার আসবে সে কথাও সত্য। কিন্তু আসল বিষয় হলো মন্দিরের 'আধুনিক' রূপ। প্রধানমন্ত্রী এই শব্দটির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। মন্দির পরিচালনার সর্বক্ষেত্রে যেন আধুনিকতা থাকে। এই মন্দির আগামীদিনের মানুষের কাছে হিন্দুধর্মের উদারতার, তার সবাইকে গ্রহণ করার, তার মুক্ত চিন্তার কথা যেন প্রচার করতে না ভোলে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এই মন্দির যেন 'নরকে নারায়ণ' হিসেবে দেখে, 'বর্তমানকে অতীতের সঙ্গে জোড়ে'। হিন্দু ধর্মের সত্য ও অহিংসার কথা এই মন্দির যেন কোনোদিন ভুলে যেতে না দেয়। তাপিত চিত্তে শান্তির আশায় আসা মানুষ এখানে যেন তাঁর জীবনের পরম শান্তি খুঁজে পান। অভুক্ত নিরাশ্রয় মানুষ যেন কয়েকদণ্ডের জন্য হলেও এখানে ঠাঁই পেতে পারেন। এমনকী চূড়ান্ত নাস্তিকও যেন এখানে এসে ঈশ্বর অনুসন্ধানের পথ খুঁজে পান। শুধু জাঁকজমকে, বৃহদায়তনে, নিজের সম্পদের বাহুল্যে, তার গগনচুম্বী রূপে এই মন্দির যেন আমাদের চক্ষু না ভোলায়। পবিত্রতা, অন্তরের প্রশান্তি, ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হৃদয়ের আত্মসমাহিত ভাব, জীবে প্রেম, মন্দির ও তার প্রাঙ্গণ যেন এই সব মহৎ গুণ আমাদের চিত্তে জাগিয়ে তোলে কাল থেকে কালান্তরে। তবেই প্রতিদিন আর অনাগত কালেও অযোধ্যার রামমন্দির হয়ে উঠবে আধুনিক, হয়ে উঠবে আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রমন্দির। ■

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

রামমন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা জাতীয় অস্মিতার পুনর্জাগরণ

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

'রাম, দুই, তিন, চার...' আমার এক কাকা গুনতেন এভাবে। ছেলেবেলায় নানান আয়োজনে ছাত্র গোনা হতো স্কুলে, পাড়ায়, ক্লাবে। যারা 'রাম' দিয়ে গোনা শুরু করতেন, সেখানে 'রাম' হয়ে নিজেকে গোনা হলে ভারী আনন্দ-অনুভূতি হতো। তাই সারির সামনে দাঁড়িয়ে পড়তাম, সেটা যদি শীতকালের স্নানযাত্রা হতো, তবুও। 'রাম' মানে 'এক', এক তখনই বিশাল হয় যখন তা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' রামের নামে উচ্চারিত হয়। ভারতের অনেক লোকায়ত মানুষ সংখ্যা গোনার ক্ষেত্রে 'এক' শব্দ ব্যবহার না করে 'রাম' শব্দটি ব্যবহার করতেন। একের যাবতীয় ক্ষুদ্রতাকে হারিয়ে দেয় 'রাম'। শ্রীরাম একজনই হতে পারেন। রাম মর্যাদাপুরুষোত্তম। শ্রীরামকৃষ্ণ সব সময় ষোলোআনা বা এক টাকার হিসেবে আত্মনিবেদনের কথা বলতেন। এক বা রাম মানে অখণ্ড। রাম মানে পূর্ণ, রাম মানে ঐশী আনন্দরূপের অনবদ্য প্রকাশ।

ভারতের লোকায়ত সংস্কারে যেখানে 'এক' ক্ষুদ্রত্ববাচক শব্দ, নিতান্তই শুরুর কথা, সেই শুরুর মাহাত্ম্যকে মহীয়ান করতে চেয়েছে ভারতবাসী। একলা চলার পথ রমণীয় করে তোলে রামবন্দনা। স্কুলের যে পাহারাদার রামুদা গুনগুন করে শ্রীরামের ভজন করতেন আর রাতের নির্জনতা একলা পায়ে খানখান করে ভেঙে দিয়ে উষার আলোয় উদ্ঘোষিত করতেন, 'শোনো ওই রামা হৈ', তাকে টীকাটিপ্পনীতে নাজেহাল করতো সেই সময়ের শাসকদলের ছাত্র-যুবরা। তবুও একক গীত গেয়ে রামনামে মুখরিত করতেন রামুদা। রামনামকে অন্তরে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন মনসেবকরা, তারাও করসেবকের চাইতে কমতি নন। তাদের মনের মধ্যে অহরহ রামশিলা পূর্জিত হতো, তাকে 'ইঁট' আখ্যা দিয়ে কোনো শাসক-মন্ত্রী মন থেকে বার করে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। অনেক ব্যবসায়ী সারাদিনে বারবার হিসেবের কাজে সংখ্যা গোনেন এবং প্রতিবার গোনার ক্ষেত্রে 'রাম' উচ্চারণ করেন। দিনে বহুবার রামনাম করা হয়ে যায় এক সহজ সরল প্রচেষ্টায়। আবার কেউ কারণে-অকারণে 'বাবর' নামটি উচ্চারণ করেন। শঙ্খ ঘোষের নাম স্বভাবত অনেকের মুখে থেকে শোনা যায়। কারণ তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থের নাম 'বাবরের প্রার্থনা'। কেন যে তিনি কাব্যগ্রন্থের নাম দিলেন 'বাবরের প্রার্থনা', শিক্ষকেরা পড়াতে গিয়ে হিমসিম!

অযোধ্যায় হনুমানগড়ি মন্দিরে আরতি করছেন শ্রী মোদী।

হ্যাঁ, তখন একটা সময় ছিল বটে! 'বাবর', 'বাবরি', এইসব নামগুলি খুব প্রচার পেতো! কাব্যে, কথা সাহিত্যে, বক্তৃতায় যে যত মুসলমান আসঙ্গ টানতে পারবেন, তিনি তত নামি সাহিত্যিক, নামি শিক্ষাবিদ, ততটাই সেকুলার। হয়তো সেই সময়ের সাহিত্যিক অবদান 'বাবরের প্রার্থনা'। কাব্যগ্রন্থের জন্য লেখক পেয়ে গেলেন আকাদেমি পুরস্কার। কবি হিসেবে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েও বলছি, নামকরণের মধ্যে যথেষ্ট মুনশিয়ানা ছিল তাঁর। গ্রন্থের 'মণিকর্ণিকা' অংশের একটি কবিতা 'বাবরের প্রার্থনা' এবং তা দিয়েই গ্রন্থের নামকরণ হলো। তাতেই কিস্তিমাত! গ্রান্থের আর কোথাও মুসলমান আসঙ্গ নেই। কবিতাটি শুরু হচ্ছে এইভাবে— ''এই তো জানু পেতে বসেছি পশ্চিম/ আজ বসন্তের রুদ্ধদ্বার'', শুধু এইটুকুই মুসলমান আসঙ্গ। বাকিটা পুরোটাই একজন অসুস্থ সন্তানের জন্য পিতার উদ্বেগ অথবা

অসুস্থ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য পূর্ববর্তী প্রজন্মের আক্ষেপ। বাবরের প্রার্থনার চতুর্থ পঙক্তি হলো ‘‘ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর/ আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।’’ কোনো মুসলমান আসঙ্গ যে কবির মনের মধ্যে ছিল না, তা ‘ঈশ্বর’ শব্দটি প্রমাণ করে। এ পর্যন্ত পর্যুদস্ত সন্ততিকে দেখে অসহায় পূর্ববর্তী প্রজন্মই প্রকাশিত শঙ্খ ঘোষে। কিন্তু ছোট্ট, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা কাব্যগ্রন্থটির নামকরণে ব্যাপৃত রইল। কারও কারও মতে বিশেষত ‘বাবর’ নামটিকে ‘এনক্যাশ’ করলেন তিনি। কাব্যগ্রন্থে অন্য উপযুক্ত কবিতাও ছিল— ‘মহানিম গাছ’, ‘হাতেমতাই’ ইত্যাদি। কিন্তু এই নামেই কাব্যগ্রন্থের নামকরণ করলেন, হাতে হাতে পুরস্কার পেলেন! সাতের দশকে জুটল আকাদেমি। কখনও আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, বনফুল সবাইকে অতিক্রম করে গেলেন। কী অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা! তাই না! ‘বাবরের প্রার্থনা’। কবি ঘোষেরও কী পুরস্কার প্রার্থনা?

কাউকে কাউকে বলতে শুনি যথার্থ ‘বুদ্ধিজীবী’ তিনি। অথচ তাঁকে ছাড়তে হয়েছিল বংশানুক্রমিকভাবে পৈতৃক বাড়ি বাংলাদেশের বরিশাল জেলার বানারিপাড়া গ্রামের বাস। বাংলাদেশের বর্তমান চাঁদপুরে জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি, বড়ো হয়েছিলেন পাবনায়। পিতার কর্মস্থল পাবনায় অবস্থান করেছিলেন, সেখান থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছিলেন। তারপর চলে এলেন কেন ভারতে?

অযোধ্যায় তো রামমন্দিরই ছিল আগে। যথাযথ ঐতিহাসিক বিচার করে রামমন্দির করাই বাঞ্ছনীয় এবং তা হয়েছে দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের বিচারে। মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে রাম কে তা বিচার্য নয়। ইতিহাসের বিচার্য সেখানে রামমন্দির ছিল কিনা। খনন কার্যে, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে প্রমাণিত হয়েছে বিতর্কিত কাঠামোর নীচে মন্দির সৌধ ছিল। যে ইতিহাসবেত্তারা গবেষণা শুরুর আগেই তার প্রতিপাদ্য বিষয় বলে দেন বা বলে দিতে পারেন, তাঁরা আর যাই হন, ইতিহাসবেত্তা নন। তাদের গল্পগাছার সম্রাট বলা যেতে পারে বলে তথ্যভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

এবার প্রশ্ন আসবে ‘রাম’ অবতার না মহাপুরুষ? রাম ঐতিহাসিক না পৌরাণিক?

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের পেট্রাপোলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে অযোধ্যার ভূমিপুজোর প্রসাদ তুলে দেওয়া হলো বাংলাদেশের ওড়াকান্দিধাম থেকে আসা মতুয়া মিশনের মিন্টু বালার হাতে। তুলে দিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পূর্বক্ষেত্রের সম্পাদক অমিয় সরকার ও অন্যান্য কার্যকর্তারা।

খুবই আনন্দের কথা যে, প্রায় পাঁচশো বছর পর অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ হতে চলেছে। এই মন্দির পূর্ণ মনে করা হবে যখন এখানে বাল্মীকিমুনিরও একটি মন্দির তৈরি হবে। ভগবান রাম বাল্মীকি কৃত রামায়ণের মুখ্য চরিত্র। এজন্য তাঁর মন্দিরে বাল্মীকিজীর বিরাজমান থাকা প্রয়োজন।

— মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ শাহ
বিদ্যার্থী
প্রাচীন বাল্মীকি মন্দির, নয়া দিল্লি

'পুরাণ' মানে হলো অতি-প্রত্ন, 'পুরাণ' মানে হলো পুরনো। রাম ঐতিহাসিক নন, প্রাগৈতিহাসিক। প্রাগৈতিহাসিক বিষয় সেটাই, যা ইতিহাসবেত্তাদের আবিষ্কারের পরিসীমার বাইরে। আর্য সভ্যতার (জাতিবাচক নয়, গুণবাচক) অনেক কিছুই প্রতিভাত নয়, কিছু দাপানো ইতিহাসবেত্তাদের জ্ঞানের বাইরে, তার মানে এটা প্রমাণিত হয় না, এটার অস্তিত্ব নেই। কারও জ্ঞানের সীমানার বাইরে তিনি ইতিহাসের নামে জোরজুলুম চালাতে পারেন না। রামায়ণ সম্পর্কে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা আছে বলেই না রবীন্দ্রনাথকে লিখতে হয়, 'কবি, তব মনোভূমি রামের জন্মস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।' যে অযোধ্যায় যুগ যুগ ধরে মানুষ শ্রীরামের নামে পূজন করে এসেছে, যে অযোধ্যার সরযূ নদীতে অবগাহন করাটা পবিত্র কৃত্য বলে মেনে এসেছে, সেখানে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার নামে বিদেশি শাসকের উচিত হয়নি, তা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া। যা হয়েছে তার জন্য দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা না করে বুদ্ধিজীবী তাকে মহিমান্বিত করার অপচেষ্টা করছেন। শ্রীরাম পূজনীয় চরিত্র ছিলেন, তিনি পূজিত হতেন ভারতবাসীর দ্বারা। অযোধ্যায় এমন দেবালয় ছিল। সেজন্যই ওই মন্দিরটি থাকবে। হিন্দুর হাজারো মন্দির লুণ্ঠন হয়েছে, হাজারো দেবালয় ভাঙা হয়েছে, এটা ইতিহাস। মন্দির বদলে অন্য ধর্মের উপাসনালয় হয়েছে।

অনেকে বলেন, ইতিহাস যেটা ঘটে গেছে, সেটা সংরক্ষণ করা উচিত। বিতর্কিত সৌধকে সেজন্যই সংরক্ষিত করা উচিত ছিল। এখন যে কোনো দেশের গৌরবান্বিত অধিবাসী নিজের রাষ্ট্রের গৌরব গাথার কথা বলতে চান, নিজস্ব ঐতিহ্যের অধিকারী বলে নিজেকে বিবেচনা করতে চান, সমস্ত রাষ্ট্রের চাইতে নিজের রাষ্ট্রকে অগ্রগামী করে তুলতে চান, তার মধ্যে স্বাভাবিক মনস্তত্ত্বই প্রকাশিত হয়, এরই নাম স্বদেশী জাগরণ, এরই নাম জাতীয় অস্মিতা। শত শত বছরের ভাঙন ও পীড়নের ইতিহাস কখনও কোনো জাতির অস্মিতা হতে পারে না। ভারতবর্ষের মানুষ চেষ্টা করেছে, ভারতভূমের প্রাচীন ঐতিহ্যকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে। যে জায়গাটা চাপা পড়ে গেছে, তা পুনর্নির্মাণ করতে চেয়েছে, এই স্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব বাধা দেওয়ার নয়, যেখানে আইনি খুঁটিনাটি বিচার করেই দীর্ঘ সময়ের পর একটি রায় এসেছে। কোনো সভ্যতা যদি বারে বারে ধ্বংস হয়, বার বারই আবার গড়ে ওঠে, ঐতিহ্য বার বার ফিরিয়ে আনা হয়, তার মধ্যে অন্যায় কোথায়? রামমন্দির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতবাসী ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ করেছে। রিফর্মিং বলা যায় একে। এটা ভারতবাসীর দিক থেকে এক স্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিক আচরণ। ভারতবাসী চেষ্টা করবে দেশীয় ঐতিহ্যকে তুলে ধরার। সুপ্রিম কোর্টের অত্যন্ত ভাবনাচিন্তার ফসল রামমন্দির সংক্রান্ত রায়দান। তাছাড়া সমপরিমাণ জমি তো সেখানেই অন্যত্র দেবার কথা বলেছে। পৃথিবীবাসীর কাছে ভারতবাসীর জানানোর বিষয় এটাই। অযোধ্যায় একটি রামমন্দির ছিল, তা ভেঙে ফেলেছিল বিদেশি শাসকের রক্তচক্ষু, আবার তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে, এরমধ্যে গর্হিত অপরাধ কোথায়?

ভারতবাসী তো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মতো ব্রিটিশ সৌধকে ভেঙে কোনো সৌধ নির্মাণ করেনি। এই রকম অনেক ব্রিটিশ সৌধই তো গড়ে উঠেছে। কারণ এই ধরনের সৌধ কোনো হিন্দুধর্মের সৌধকে ভেঙে গুঁড়িয়ে নির্মাণ করা হয়নি। যেখানে যেখানে মন্দির ছিল, সেখানে সেখানে তা গুঁড়িয়ে মসজিদ তোলা কী গর্হিত কাজ নয়? নিশ্চয়ই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আপন ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। কিন্তু কখনোই শাসক অস্ত্রের জোরে শাসিতের ঐতিহ্য ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারেন না। মনে রাখতে হবে, 'পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।' কোনো বিদেশি শাসক যদি আগ্রাসন করে থাকেন, তবে পরবর্তী মানুষ তা সংশোধন করতে পারবেন না কেন? ইতিহাসের ভুলের কী সংশোধন হবে না? দেশবাসীর অপমানের জায়গাটার প্রতিশোধ এবং প্রতিকারের জায়গাটি হলো রামমন্দিরের পুনর্নির্মাণ। তখনকার অপমানিত মানুষ যা করতে পারেননি, চুপ করে মুখ বুজে থাকতে বাধ্য ছিলেন, আজকে তা আইন মেনে করাতে পারলেন। রামমন্দিরের ভূমিপূজন তাই দেশবাসীর দ্বিতীয় স্বাধীনতা দিবস।

বিশেষ আবেদন

বর্তমান করোনা মহামারীর ভয়াবহ পরিস্থিতিতে স্বস্তিকা মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। www.eswastika.com এতে ইন্টারনেট সংস্করণ নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে।

স্বস্তিকার সকল প্রচার প্রতিনিধি, পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি বিশেষ আবেদন, আপনারা স্বস্তিকার ইন্টারনেট সংস্করণটি আপনার পরিচিতদের মধ্যে হোয়াটস্অ্যাপ বা ই-মেলের মাধ্যমে পৌঁছে দিয়ে স্বস্তিকার প্রচারে আমাদের সহযোগিতা করুন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

অযোধ্যায় রামশিলা (ইঁট) পূজা করছেন অযোধ্যা আন্দোলনের অন্যতম মহন্ত পরমহংস রামচন্দ্র দাস। সঙ্গে রয়েছেন অশোক সিংঘল (১৯৮৮)।

রামমন্দিরের শিলান্যাস

ভারতীয় নবজাগরণের সূচনারই প্রকাশ

ড. তুষার কান্তি ঘোষ

'শ্রীরাম' ভারতের মানুষের হৃদয় উদ্বেলিত একটি নাম। এই 'নাম' জন্ম-জন্মান্তরের কালপ্রবাহকে অতিক্রম করে বয়ে চলা এক জীবনবোধ। জন্ম-মৃত্যুরহিত এক ব্রহ্মশক্তি রামচন্দ্রের রূপ ধরে কেবলমাত্র জীবের কল্যাণের জন্য এই মর্ত্য পৃথিবীতে এসেছিলেন। বিশ্বকবি অসাধারণ কথাকে সহজ ভাবে বলেছেন, ''বাল্মীকির রামচরিত কথাকে পাঠকগণ কেবলমাত্র কবির কাব্য বলিয়া দেখিবেন না তাহাকে ভারতবর্ষের দ্বারা ভারতবর্ষকে ও ভারতবর্ষের দ্বারা রামায়ণকে যথার্থ ভাবে বুঝিতে পারিবেন। পরিপূর্ণ মানবের আদর্শ চরিত্র ভারতবর্ষ শুনিতে চাহিয়াছিল এবং আজ পর্যন্ত তাহা অশ্রান্ত আনন্দের সহিত শুনিয়া আসিতেছে। একথা বলে নাই যে, বড়ো বাড়াবাড়ি হইতেছে, একথা বলে নাই যে, এ কেবল কাব্যকথা মাত্র। ভারতবাসীর ঘরের লোক এত সত্য নহে— রাম লক্ষ্মণ সীতা তাদের পক্ষে যত সত্য।''

শ্রীরামচন্দ্রের কঠোর আত্মত্যাগ এবং সংগঠন কুশলতা ভারতবর্ষের দুটো যুগের— ত্রেতা, দ্বাপর— মধ্যে এক বিশিষ্ট ইতিহাস ধারার প্রকৃতি লক্ষ্য করেছেন বিশ্ববাসী। সীতা হরণের পর এক অচেনা অজানা দেশকে জানতে পেরে নারীত্বের মূল্য প্রতিষ্ঠা ও বলদর্পী রাবণের স্বর্ণ সভ্যতার অহংকারকে বিধ্বস্ত করেছিলেন শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ, শুধুমাত্র অরণ্যবাসী বানর সদৃশ মনুষ্যকুলের সাহায্যে। এই অরণ্যবাসী খুবই পণ্ডিত ছিলেন না, তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন না, তবুও তাঁরা দুর্ধর্ষ রাবণের সাম্রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। হাতে তেমন অস্ত্র ছিল না, এমনকী গাছের ডাল নিয়ে তারা সমুদ্র পার হয়ে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। 'বন বন মে ভটকনে'-বালা রাম এই সৈন্যদের একটি পয়সাও দিতে পারেননি যুদ্ধের সৈনিক হিসেবে। এই সৈন্যদের কণ্ঠে ছিল শ্রীরামের হর্ষধ্বনি আর সীতামাতাকে যে রাবণ হরণ করেছে তাকে হত্যার সংকল্প।

এর পরেই ভারতবর্ষ কেমন পালটে গেল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্ম দ্রোণচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণের মতো বীর তত্ত্বজ্ঞানী বিদ্যাবিশারদের সামনে প্রকাশ্য রাজসভায় কুলবধূ দ্রৌপদীর চরম লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করেছিলেন। এরাই আবার 'রাবণ'কে সমর্থন করে যুদ্ধ করলেন ন্যায় ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা পাণ্ডবদের বিপক্ষে, এমনকী পরম প্রেমময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরোধিতা করেও। কোটি কোটি সুবর্ণমুদ্রা যুদ্ধাগ্নিতে ভস্মীভূত হলো, কোটি কোটি রাজসৈন্য-সহ রথী- মহারথীরা নিহত হলেন। এই

অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের উদ্দেশে লালকৃষ্ণ আদবানির নেতৃত্বে সোমনাথ থেকে অযোধ্যা রথযাত্রা। সঙ্গে রয়েছেন নরেন্দ্র মোদী।

অন্যায়বোধ, রামচন্দ্রের পর একটি যুগ বিবর্তনে এমন নৈরাজ্য, এমন হিংস্র পাশবিকতা, ভারতবর্ষকে গ্রাস করল কীভাবে? এই তত্ত্বজ্ঞানীরা কী মনুষ্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ জীবনবোধের গ্রন্থ রামায়ণের একবারও একটি পাতাও উলটে দেখেননি। জানতেন না? যে রামচন্দ্র সর্বজীবের সর্বকালের আদর্শপুরুষ। প্রেরণা পুরুষ। ধর্মই তাঁর বীরত্বের প্রকাশ।

তাই রামায়ণের রামরাজত্ব এক প্রাণবন্ত রাজ্য পরিচালনার ধারার প্রতীক। এতে সর্বকুলের সমৃদ্ধি। সকলের শান্তি। সকল প্রজারই আধ্যাত্মিক উন্নতি। রামায়ণে কৃষিক্ষেত্রগুলোর এমন সুন্দর বর্ণনা— এ যেন মনুষ্যকুলের আর্থিক উন্নতির সোপান। দেশ রক্ষার্থে শ্রীরামের প্রত্যক্ষযুদ্ধ অসুর ও রাক্ষসকুলের সঙ্গে, সামাজিক সুরক্ষার বিশিষ্ট ঘটনা— রাজাই প্রজাগণের রক্ষার প্রত্যক্ষ অধিকারী— আমলাতন্ত্র নয়।

পূর্ণ ব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র আদর্শ পুত্র, আদর্শপতি, আদর্শ নৃপতি; তিনিই হিন্দুদের প্রাণপুরুষ পরমারাধ্য দেবতা। পবিত্র নিষ্ঠাবোধই শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি অযোধ্যাকে করেছে পুণ্যতীর্থ, ভক্তজনের পরম পবিত্র দর্শনীয় স্থান রূপে।

২

ভারতের পল্লীতে পল্লীতে গাওয়া রামায়ণ কাহিনির রামকে পৃথিবীর আপামর দেশ কীভাবে নিজের জীবনাদর্শরূপে গ্রহণ করল— তাতে বিস্মিত হতে হয়। সমগ্র পৃথিবী চেয়েছিল শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সীতার মতো আদর্শ মানব-মানবী তাদেরও ঘরে জন্মগ্রহণ করুক। এই পৃথিবীতে পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম, পতি-পত্নীর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, মাতৃভক্তি, বন্ধুত্বের সর্বোচ্চ নিদর্শন, দেশপ্রেম, প্রজার প্রতি রাজার বাৎসল্য— যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন দেশকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাই আজও রাশিয়াতে পাওয়া গিয়েছে রামচন্দ্রের জীবন অনুসারে বহু ভাস্কর্য ও চিত্র। রাম-রাবণের যুদ্ধের চিত্র যা আজও লেলিন গ্রাডের ইনস্টিটিউট অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ অব ইউএসএসআর অ্যাকাডেমি অব সাইন্সেস-এ রাখা আছে (সূত্র : The Image of India– Progress Publishers, Moscow)। রাশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন রামায়ণ অন্তর্ভুক্ত করা হলো সেদিন ক্রুশ্চেভকে প্রশ্ন করা হলে ক্রুশ্চেভ বলেছিলেন রাশিয়ায় রাম-লক্ষ্মণের মতো ভাই, সীতার মতো পত্নী পাওয়া গেলে দেশের জীবন ধারায় উন্নতি ঘটবে।

রামায়ণে বীর সুগ্রীব সীতার খোঁজে তাঁর অনুগামীদের যবদ্বীপে পাঠিয়েছিলেন। এই যবদ্বীপের বর্তমান নাম জাভা, সুমাত্রা ও বালি। সুমাত্রা, জাভা ও বালিতে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি নিয়েই তাদের শিক্ষাদর্শন। বালিতে সংস্কৃতিক জীবন 'রামায়ণ' ময়। পুতুলনাচ থেকে মানবীয় নৃত্যতে ঋংকৃত বালির সভ্যতা। তাদের বাড়িগুলো মন্দিরের মতো। রাস্তায় রাস্তায় দেখা যায় শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে সাংস্কৃতিক জীবনের বহমান ধারাই বলো রামায়ণ। মঞ্চে অভিনীত সীতা, রাম-লক্ষ্মণ, রাবণ, শিব-দুর্গার অভিনয়ে জীবন্ত ভারত প্রকাশিত হয়ে উঠে ইন্দোনেশিয়া থেকে থাইল্যান্ড, শ্যাম-কম্বোজ থেকে যবদ্বীপে।

এই দেশগুলোর অনেকে ইসলামকে গ্রহণ করেছে কিন্তু শ্রীরামকে ক্ষণিকের তরেও ছাড়েনি। রামায়ণ কাহিনির এই নৃত্যগুলোর নাম— সেমারায়ানা নৃত্য, তোপেং নৃত্য, তৃণা-জয়া নৃত্য, যুডাপতি (যুদ্ধাপতি) নৃত্য, ওয়ালি নৃত্য, চন্দ্রাংশী নৃত্য ইত্যাদি। আজও বালির উবুদে ও ডেনপাসারে রাজপ্রসাদের সামনে সন্ধ্যায় রামায়ণ নৃত্যানুষ্ঠান হয়। এই দ্বীপময় দেশে অজস্র ভ্রমণকারী যখন বিদেশ থেকে আসছেন তখন তাঁরা রামায়ণ সংস্কৃতি দেখে মুগ্ধ হয়ে নিয়ে চলেছেন ভারতীয় সভ্যতা, হিন্দু শিল্প-সাহিত্যের অমর বার্তার বাণীবদ্ধ রূপ।

শিকাগোর 'Field Museum of National History'-তে সংরক্ষিত আছে রামায়ণে বর্ণিত বিভিন্ন ভাস্কর্য মূর্তি। বিশিষ্ট গবেষক জুয়ান আর ফ্রান্সিসকো ফিলিপাইন্সের মুসলমান মারানাও বাসিন্দাদের মধ্যে বহুকাল ধরে একটা রামায়ণ প্রচারিত হওয়ার কথা বলেছেন। এই ফিলিপাইনের অবতার বলে শ্রীরাম আজও পূজিত। 'রামা হরি' মঞ্চে অ্যালিস রেইস নামে এক কোরিও গ্রাফারের পরিচালনায় মুসলমান যুবক যুবতীদের অংশগ্রহণে রামায়ণের ব্যালে নৃত্য আজও আকর্ষণীয়। তারাও জগতের বিভিন্ন দেশে পৌঁছে দিচ্ছেন রামায়ণের জীবনবোধ।

চীনে 'রামকথা' কী ব্যাপকভাবে প্রচলিত তার বিবরণ দিয়েছেন W.H.D. Rouse (Cambridge 1901) কত দেশে এই ভাবে জনজীবনে প্রকাশিত আছে শ্রীরামের মহান জীবনের কাহিনি।

ছদ্মবেশে অযোধ্যা করসেবকদের মাঝে অশোক সিংহল (১৯৮৯)।

৩

বাল্মীকি-রামায়ণের পুরুষোত্তম নায়ক দশরথি রাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন অযোধ্যায়। কোশল রাজ্যের রাজধানী ছিল অযোধ্যা। যুগ যুগ ধরে এই অযোধ্যায় বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামের জন্মস্থানে ভক্তিভরে পূজা-অর্চনা ও শ্রদ্ধা-প্রার্থনা নিবেদন করে আসছেন আপামর হিন্দুসমাজ। তখন ইসলামের আবির্ভাবও হয়নি সমগ্র বিশ্বে।

প্রাচীনকাল থেকেই অযোধ্যার বিবরণ দেওয়া আছে প্রাচীন গ্রন্থগুলোতে।

অষ্টাচক্র নবদ্বারা দেবানাং পুরাযোধ্যা।
তস্মত্রং হিরণীয়ঃ কোন স্বর্গৌ জ্যোতিষাবৃত।।

অথর্ববেদ : ১০।২।৩১

মূলাধার, নবদ্বারা অষ্টচক্র-সহ অযোধ্যাপুরীর ভিতর স্বর্ণময়। অযোধ্যাকে ব্রহ্মময়ী বৈকুণ্ঠধাম বলে অভিহিত করা হয়েছে। অযোধ্যা অযোধ্যা কালের বিবর্তনে ও প্রশাসনিক ব্যবহারে শ্রীরামচন্দ্রের প্রাসাদ নিহিত ও সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। প্রতি কার্তিক মাসে অজস্র হিন্দু জণগণ চোদ্দক্রোশী ও পঞ্চদ্রোশী পরিক্রমায় অযোধ্যাকে পরিক্রমণ করেন। কার্তিক পূর্ণিমায় এই পরিক্রমণের অর্থ শ্রীরামের জন্মভূমি অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ ছিল চৌদ্দ ক্রোশ লম্বা ও পঞ্চ ক্রোশ চওড়া। অযোধ্যার রামকোটে রামচন্দ্র একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। দুর্গের চারিদিকে কুড়িটি বুরুজ ছিল, যার উপর উঠে সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বুমান প্রভৃতি বীরেরা নগর রক্ষা করতেন। দুর্গের মধ্যে ৮টি রাজপ্রাসাদ ছিল।

সরযূর তীরে এই নগরী ধনসম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। অত্যন্ত সুদৃশ এই নগর। কুসুম বৃক্ষে সজ্জিত এর রাজপথগুলো নগরীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করত। অসংখ্য তোরণ দ্বারা নগরীতে প্রবেশ করা যেত। নারীর চারিপাশে ছিল পরিখা। অযোধ্যা সুউচ্চ নগরী ছিল যার জন্য এখানে প্রবেশ করে কেউ যোধ্যার ভূমিকা গ্রহণ করতে পারত না, তাই এই নগরী ছিল অযোধ্যা। দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞের সময় সমগ্র ভারতবর্ষের রাজারা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেই বর্ণাঢ্য রূপের কথা কাল্মীকি দিয়েছেন।

রামচন্দ্রের তিরোধানের পর এই নগরীতে এই রামচন্দ্রের এক ভব্য মন্দির নির্মিত হয়। এই মন্দির বিষ্ণু হরি মন্দির নামেও পরিচিত ছিল।

বিশিষ্ট গবেষক ড. পি.ডি. বর্তক তিনি রামায়ণের উপর দীর্ঘকাল গবেষণা করেন। তাঁর মতে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন খ্রিস্টপূর্ব ৭৩২৩-এর ৪ ডিসেম্বর মঙ্গলবার। তিনি বনবাসে যান বৃহস্পতি, ২৯ নভেম্বর ৭৩০৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এর ঠিক ছয়দিন পর অর্থাৎ ৫ ডিসেম্বর বুধবার দশরথ দেহত্যাগ করেন। রাবণের মৃত্যু হয়েছিল ১৫ নভেম্বর, রবিবার ৭২৮২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। রামচন্দ্র ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যায় পুষ্পক

রামমন্দিরের করসেবায় যোগ দিয়ে পুলিশের গুলিতে শহিদ হয়েছেন কলকাতার দুই ভাই রাম কোঠারি ও শরদ কোঠারি (১৯৮৯)।

রথে ফিরে আসেন।

সীতার গৃহাঙ্গণে প্রবেশ ঘটেছিল কুশের ১২ বছর বয়সে। এর পরেই কুশলবের সিংহাসন অভিষেক, ভাইদের পুত্রদের বিভিন্ন রাজ্যে অভিষেকের পর শ্রীরামচন্দ্র সরযূতে বহুজন সমেত সলিল সমাধি গ্রহণ করে স্বর্গারোহণ করেন। এই সব ঘটনার কাল প্রবাহ প্রায় ৩৫ বছর। অর্থাৎ রামচন্দ্রের প্রয়াণকাল ৭২৬৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ অযোধ্যায় রামমন্দির হয় এর পরবর্তী কালেই। শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি মন্দিরের সংস্কার কাহিনিও বিশিষ্টতায় পূর্ণ। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে রামচন্দ্রের রাজত্বের দীর্ঘকাল পর রাজা ঋষভ অযোধ্যায় রাজত্ব করেছিলেন। মহাভারতের যুদ্ধের পূর্বেই ঋষভের রাজত্বকাল চলেছিল বলে মনে করা হয়। তাঁর শাসনকালে অযোধ্যা নগরী আবার আলোয় আলোকিত হয়ে উঠে। ঋষভ রামমন্দিরে লক্ষ্মণ হনুমান প্রভৃতি মূর্তি স্থাপন করেন।

মহাভারতের যুদ্ধের পর ভারতবর্ষ নৃপতিহীন, শ্রীহীন হয়ে পড়ে। এই সময়কালে রাজা পরীক্ষিৎ অযোধ্যারা দেখভাল করতেন। পরে যুগের প্রবাহে অযোধ্যা জঙ্গলে অকীর্ণ হয়ে পড়ে। অযোধ্যার সৌন্দর্য প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে সাতবাহনদের নরপতি বিক্রমাদিত্য উপাধিধারী এক সম্রাট প্রায় ৫৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অযোধ্যা নগরীর সংস্কার সাধন করেন। রামজন্মভূমি মন্দিরের পুনসংস্কার করেন। শুধু তাই নয় তিনি অযোধ্যাতে শ্রীরামচন্দ্রের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলিকে আকর্ষণীয় করে অযোধ্যার শ্রীবৃদ্ধি করেন। মন্দিরে তিনি সীতা-রামের মূর্তি স্থাপন করেন।

বিক্রমাদিত্য পুষ্যমিত্র পুনরায় অযোধ্যায় জনজীবনকে সমৃদ্ধশালী করেন। রামচন্দ্রের অযোধ্যাকে তিনি দ্যুতিময় করে তোলেন। তিনি তাঁর রাজধানীও অযোধ্যায় প্রতিষ্ঠিত করেন। হরপ্রসাদ রায়ের মতে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে পরবর্তীকালে অযোধ্যা নগরীকে আগের মতো নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করতে হয়নি। গুপ্ত রাজত্বকালে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময় অযোধ্যা পুনরায় সংস্কারিত হয়। একটি সংস্কৃতের লিপি অনুসারে ২৪৩১ যুধিষ্ঠির সংবতের পৌষ মাসের দ্বিতীয় অমাবস্যায় রাজা বিক্রমাদিত্য রামের মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করে রামসীতার বিগ্রহ স্থাপন করেন। (District Gazeetler Faizabad, 1960, p. 353)। রাজা বিক্রমাদিত্য অযোধ্যায় খনন কার্য শুরু করেন এবং রামচন্দ্রের রাজপুরীর সন্ধান পান। ক্রমে ক্রমে দশরথের চারপুত্র ও হনুমানের মূর্তি ঘোদিত ছিল। তিনি রামচন্দ্রের জন্মস্থান ও রাজপুরী সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন। এছাড়া তিনি অযোধ্যাকে গরিমাময় করে তোলার জন্য বহু মন্দির নির্মাণ করেন। এই মন্দিরগুলির সংখ্যা প্রায় ৩৬০।

স্তম্ভে যে মূর্তিগুলো আছে এই মূর্তি স্মৃতি শাস্ত্র অনুসারে শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যানমূর্তি —অভিমত হরপ্রসাদ রায়ের। একটি ধ্যানের স্বরূপ—

'অযোধ্যা নগরে রম্যে রত্ন সৌবর্ণ মণ্ডপে।
মন্দার পুষ্পৈরাবদ্ধ বিতানে তোরাম্বিতে
সিংহাসন সমারাঢং পুষ্পাকোপরি রাঘবম।'

পরবর্তীকালে দীর্ঘ বছর ধরে গাড়োয়ালের নৃরতিরা অযোধ্যায় শ্রীরামপুরীও রামচন্দ্রের সংস্কার সাধন করে এসেছিলেন।

৫

ভারতবর্ষের এই ঐতিহ্যশালী মন্দিরকে বাবরের অযোধ্যা অবস্থাকালে ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সেনাপতি মীর বাকী এই মন্দির ধ্বংস করে একে মসজিদে পরিণত করলেন। এর প্রচলিত নাম দিলেন বাবরী মসজিদ। "Min Baqi of Tashkrint Perhaps a better epithet for saadat–nishan than 'good hearted' would be one implying his good fortune in being designated to build a mosque on the site of the ancient Hindutemple." (Babur-Nama Tr. by A.S. Beveridage, D.K. Publishers and Distributor P. Ltd. Delhi-52 1995, in the Chapter-U-'The inscriptions on Babur's Mosque in Ajodhya (Oudh) - Page-xxvii')।

ভারতবর্ষ রামচন্দ্রের এই ঐতিহ্যময় মন্দিরের বিলোপ সাধন মেনে নেননি। এই সময় ভীষণ যুদ্ধে প্রায় ১.৭৪ লক্ষ মানুষ প্রাণ বলিদান করেন। পরবর্তীতে মোগল আমলে মন্দির উদ্ধারের চেষ্টা হয় স্বামী মহেশ্বরানন্দের নেতৃত্বে। সংগ্রামীদের শপথ ছিল— 'জন্মভূমি উদ্ধার করে যা দিন বৈরীভাগ ছাতাপগ পনহী ঔর ন বাঁধাই পাগ— যতদিন না শত্রুজয় করে আমরা রামমন্দির মুক্ত করতে পারি ততদিন মাথায় ছাতা দেব না, জুতা পরব না পাগড়িও বাঁধব না। এমনকী হিন্দু মেয়েরা দল বেঁধে পুজো দিয়ে যেত ও তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হতো 'জয়শ্রীরাম— ন বাঁধা পাগ'। হুমায়ুনের রাজত্বকালের ইতিহাসে এই মন্দির দখল ও পুনর্দখলের। আকবর তো সংগ্রামীদের সন্তুষ্ট করতে রাম-সীতার মূর্তিখোদিত রৌপ্য মুদ্রা চালু করেন। নিকোশো কান্তি ও ধ্বংসপ্রাপ্ত অযোধ্যায় দেবালয়ে হিন্দুদের পুজো অর্চনার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। ইংরেজ আমলেও জন্মস্থান আখড়ার মোহন্ত রামকিশোর দাসের নেতৃত্বে লড়াই চলে। এই নিয়ে মামলা হলেও ১৮৮৫-তে বলা হলো— "The place where the Hindus worship is in their possession from old and their owner she cannot be questioned." এই মন্দির নিয়ে এত লড়াই কেন? হিন্দুদের বহু মন্দির ভেঙে এখনও মসজিদ অবস্থায় আছে, সেখানেতে এত সংঘর্ষ হয়নি। তার কারণ ভারতবর্ষের হিন্দুদের অস্মিতার প্রশ্ন স্বয়ং রামচন্দ্রের জন্মস্থানের মন্দিরের উপর। কারও অধিকার মানব না এই স্থানে।

৬

রেনেসাঁসের অর্থ পুনর্জন্ম। এত সংঘর্ষের পর রাম জন্মভূমি রামমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলো। এ শুধু জয় নয়— এই মন্দির হিন্দুদের আত্মবিশ্বাস ও গৌরবের প্রতীক। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতে রামায়ণেরপ মহত্ত্ব বিশাল। রামায়ণই যে যুগে যুগে ভারতীয় চিত্ত ও চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত ও রূপদান করেছে তা নয়, ভারতীয় চিত্ত কালে কালে নিজের প্রয়োজন মতো রামায়ণকে নব নব রূপে গড়ে নিয়েছে। এই সত্যের ধারা সুদূর প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেছে এবং পূত সলিলা গঙ্গার স্রোতের মতোই ভারতীয় চিত্ত ভূমিকে চির শ্যামল করে রেখেছে। শ্রীরামচন্দ্রের জীবন কাহিনির এই উপাখ্যানই ভারতীয় রেনেসাঁস— ভারতের অস্মিতার নবজন্ম। কারণ মন্দিরের অধিকার আজ ফিরে এসেছে। ■

অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দিরের শিলান্যাসের মুহূর্তে দেশজুড়ে খুশির জোয়ার।

বনবাসী ভারতের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন

সন্দীপ চক্রবর্তী

পিতৃসত্য পালনে শ্রীরাম চোদ্দ বছরের জন্য বনে গিয়েছিলেন। তারপর সম্মুখ যুদ্ধে রাবণকে বধ করে পত্নী সীতা এবং সহোদর লক্ষ্মণ-সহ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন। সেইসময় বা তার পরবর্তীকালে সহস্রাধিক বছর পর্যন্ত কেউ ভাবতে পারেনি এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আরও একবার ঘটতে পারে। কিন্তু এমন একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছিল। এবং এমনভাবে ঘটেছিল যাতে কোনও ব্যক্তিবিশেষ নন, একটি দেশ বা আরও স্পষ্ট করে বললে সমগ্র একটি জাতি বনবাসে গমন করতে বাধ্য হয়। দেশটির নাম ভারতবর্ষ। আর জাতির নাম হিন্দু। মধ্য এশিয়া থেকে এসে বাবর নামের এক লুটেরা হিন্দুদের বাধ্য করেছিল নিজভূমে পরবাসী হয়ে থাকতে। এই পরবাস ছিল বনবাসেরই নামান্তর। গত ৫ আগস্ট অযোধ্যায় রামমন্দিরের ভূমিপূজনের মাধ্যমে শেষ হলো ভারতবর্ষের পাঁচ শতাব্দীর বনবাস। বনবাসী ভারত ফিরে পেল তার দেশ। তার স্বাভিমান। হাজার বছরের ইসলামিক শাসন, দু'শো বছরের ব্রিটিশ শাসন এবং সত্তর বছরের ব্রিটিশ মডেলের দেশীয় শাসনের নৈরাজ্য পেরিয়ে ভারতবর্ষ স্বাদ নিল তার নিজস্ব জাতিসত্তার।

প্রশ্ন উঠবে, ভারতীয় জাতিসত্তার সঙ্গে রামমন্দিরের ভূমিপূজনের কী সম্পর্ক? এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে আমাদের বুঝে নিতে হবে রাষ্ট্র এবং দেশের পার্থক্যটি। যে কোনও ভূখণ্ডকেই সেখানকার অধিবাসীদের দেশ বলা যেতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র বলা চলে না। একটি রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অস্তিত্ব তো থাকতেই হবে। সেইসঙ্গে থাকতে হবে একটি প্রাচীন সংস্কৃতিসম্পন্ন পরম্পরা। থাকতে হবে তার নিজস্ব অস্মিতা। অর্থাৎ জ্ঞান এবং সংস্কৃতি, ইতিহাসও। এই অর্থে ভারত একটি রাষ্ট্র। কিন্তু পাকিস্তান নয়। কারণ পাকিস্তানের যে অস্মিতা তা মূলত ভারতেরই। নিজস্ব জ্ঞান এবং সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ মানবগোষ্ঠীই কালক্রমে জাতি হিসেবে পরিগণিত হয়। তাই যে-অর্থে জার্মান, ফরাসি, ব্রিটিশরা একেকটি জাতি, সেই একই অর্থে হিন্দুরাও একটি জাতি। নিজস্ব জাতিসত্তার অধিকারী। পার্থক্য শুধু একটি জায়গায়। বিশ্বের প্রতিটি জাতির এক বা একাধিক জাতীয় নায়ক থাকেন। যারা তাদের চরিত্র দিয়ে, আদর্শ দিয়ে সমগ্র জাতিকে একসূত্রে বেঁধে রাখেন। একটি জাতির জীবনবোধ কিংবা মানসিক গঠন কেমন হবে তার অনেকখানি পরিচয় পাওয়া যায় তাদের জাতীয় নায়কের জীবন বিশ্লেষণ করলে। উদাহরণস্বরূপ, মাওকে যদি চীনের জাতীয় নায়ক

হিসেবে গ্রহণ করি তা হলে আজকের চীনের নৃশংস এবং অত্যাচারী কার্যকলাপের কারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না। যাই হোক, মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাই। ভারতীয়দের জাতীয় নায়কের জায়গায় বহু প্রাচীন কাল থেকেই শ্রীরামের অবস্থান। কারণ তিনি আনুমানিক সতেরো হাজার বছর আগে নানান জাতি-উপজাতিতে বিভক্ত ভারতীয়দের এক ছাতার নীচে এনেছিলেন। উদ্দেশ্য, দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন। আমাদের মনে রাখতে হবে, সেযুগে রাবণ ছিলেন প্রবল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। সন্ত্রাসবাদী শক্তিও বলা যেতে পারে। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারত রাবণের ভয়ে কাঁপত। সীতা-উদ্ধার উপলক্ষ্যে শ্রীরাম প্রবল পরাক্রমী রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। এবং রাবণকে বধ করে দক্ষিণ ভারতের একাধিক জনপদকে রাবণের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু এটুকুই কি জাতীয় নায়ক হবার জন্য যথেষ্ট? না। অযোধ্যায় ফিরে তিনি রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং স্থাপন করেছিলেন প্রজাকল্যাণের অনুপম দৃষ্টান্তসমূহ। আজও আদর্শ রাষ্ট্রের উদাহরণ দেবার সময় রামরাজ্যের কথা বলা হয়। পুত্র, স্বামী, ভ্রাতা, পিতা ও সম্রাট-পরিবার ও রাষ্ট্রের প্রতিটি ভূমিকাতেই তিনি আদর্শ, মর্যাদাপুরুষোত্তম। ভারতবর্ষের জাতীয় নায়ক। এ দেশে মুঘল সলতনত্

রামমন্দির নির্মাণের পর বদলে যাবে ভারতের রাজনীতি। সেই বদলে যাওয়া রাজনীতিতে রাষ্ট্রবিরোধীদের টিকে থাকা শুধু কষ্টকরই নয়, প্রায় অসম্ভব। কারণ দেশবিরোধিতা না থাকলে তাঁদের রাজনীতি শূন্যগর্ভ হয়ে উঠতে বাধ্য।

কায়েম করেই বাবর শ্রীরামের সর্বময় উপস্থিতি টের পেয়েছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন হিন্দুদের জাতিসত্তার মেরুদণ্ডটি ভাঙতে হলে আগে শ্রীরামের ভাবমূর্তিটি নষ্ট করতে হবে। নয়তো হিন্দুস্থানকে গোলাম বানানো যাবে না এবং সেইজন্য বেছে নিয়েছিলেন অযোধ্যাকে। অযোধ্যা শ্রীরামের জন্মস্থান। যে রামায়ণী ভাবধারায় আপামর ভারতবাসী শ্বাস-প্রশ্বাস নেয় তার কেন্দ্রবিন্দু হল এই অযোধ্যা। এই শহরের সুমহান মর্যাদা যদি মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া যায় তা হলে হিন্দুরা কোনওদিনই বিদেশি শাসকের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। সুদীর্ঘকাল ধরে মুঘল সাম্রাজ্যের গোলামি করতে বাধ্য হবে। ঠিক এই উদ্দেশ্যেই বাবর অযোধ্যার রাম জন্মস্থান মন্দির ধ্বংস করে সেই জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করান। এই একই কারণে মথুরার কৃষ্ণমন্দির এবং গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরও বারবার আক্রান্ত হয়েছে। বারাণসীর বিশ্বনাথ মন্দিরের চৌহদ্দির মধ্যে তৈরি করা হয়েছে মসজিদ। সুতরাং ৫ আগস্টকে শুধুমাত্র রামমন্দিরের ভূমিপূজনের দিন বললে

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোদীকে শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি প্রদান করছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

ভুল হবে, বিলুপ্তপ্রায় ভারতীয় জাতিসত্তার পুনরুত্থানের দিন হিসেবেও এই দিন পরবর্তীকালে মান্যতা পাবে।

ভারতীয় জাতিসত্তার ভিতটি যে এখনও বেশ দুর্বল এবং নানাভাবে বিভক্ত তা টের পাওয়া যায় ভূমিপূজনের দিন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, নেতৃবৃন্দ এবং মিডিয়ার একাংশের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলে। আসাদুদ্দিন ওয়েসির বক্তব্য ঃ ৫ আগস্ট অযোধ্যায় রামমন্দিরের ভূমিপূজনের জন্য ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ লঙ্ঘিত হয়েছে। এবং ভূমিপূজনে পৌরোহিত্য করে শ্রীনরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নেওয়া তাঁর শপথ ভঙ্গ করেছেন। ওয়েসি সাহেবের কথা শুনলে সত্যিই আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, ধর্ম ও মজহবের পার্থক্য না বুঝে এই ধরনের বালখিল্য মন্তব্য আপনি করেন কোন সাহসে? হিন্দু ধর্ম ইসলামের মতো নিছক একটি উপাসনা পদ্ধতি নয়। কোনও হিন্দু ধর্মগ্রন্থে ঈশ্বর ভজনাকে গুরুত্বহীন করে দিয়ে কত ইঞ্চি চুল-দাড়ি রাখতে হবে তার লম্বা ফিরিস্তি দেওয়া হয়নি। যজমানের পাজামার ঝুলও মাপেন না হিন্দু মন্দিরের কোনও পুরোহিত। হিন্দুদের কাছে ধর্ম হলো জীবনবোধ এবং বিশ্ববোধ। এই দুই বোধের প্রসারে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তারাই হিন্দুদের দেবী ও দেবতা। এরা প্রত্যেকেই জন্মসূত্রে মানুষ কিন্তু গুণকর্মে দেবতা। এদের কাছে যা সত্য তাই ধর্ম। শ্রীরাম সারাজীবন সত্যের পথ অনুসরণ করেছেন। তাঁর জীবনযাপন তঁাকে মানুষের কাছে প্রিয় করে তুলেছে। আর প্রিয় হয়েছেন বলেই দেবতা হয়েছেন। এবার আপনি বলুন ওয়েসি সাহেব, এমন একজন মানুষের মন্দির তৈরি হলে ধর্মনিরপেক্ষতা কীভাবে লঙ্ঘিত হয়? বাকি রইল শ্রীনরেন্দ্র মোদীর শপথ ভঙ্গের প্রশ্ন। বলা বাহুল্য এই প্রশ্নটিও বালখিল্যপনায় আক্রান্ত। অন্তত আজকের ভারতবর্ষের বিরোধী রাজনীতিতে মুসলমান-তোষণের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে একথা মনে হবেই। প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় মনমোহন সিংহ যখন ইফতার পার্টিতে মাথায় ফেজ টুপি পরে বসে থাকতেন তখন তো আপনি শপথ ভঙ্গ করার অভিযোগ করেননি। পশ্চিমবঙ্গের

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মাথায় হিজাব পরে নামাজ পড়েন তখনও তো কিছু বলেন না। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী যখন খ্রিস্টান লবির চাপে হিন্দু মন্দিরের ভূসম্পত্তি ষড়যন্ত্র করে হাতিয়ে নেবার পরিকল্পনা করেন তখন কেন মুখ খোলেন না ওয়েসি সাহেব? প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে কোনও বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করার শপথ কি নরেন্দ্র মোদী একা নিয়েছেন?

ভূমিপূজনের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ, করোনা মহামারীর প্রকোপে দেশের অর্থনীতি যখন বিপর্যস্ত তখন কেন এই সময় কোটি কোটি টাকা খরচ করে মন্দির নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো? এই অভিযোগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে আরও একটি ভুল তথ্য। বলা হচ্ছে মন্দির নির্মাণের খরচ নাকি কেন্দ্রীয় সরকার ব্যয় করবে। ভারতবর্ষের সৌভাগ্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী নন। যদি হতেন তা হলে রামমন্দির নির্মাণে কেন্দ্র টাকা না জোগালেও সারা দেশে সরকারি খরচে দশ-বিশটা হজ হাউস বানিয়ে দিত। ঠিক যেরকম মাননীয়া পশ্চিমবঙ্গে বানিয়েছেন। যাই হোক, অভিযোগের উত্তরে বলা যেতে পারে রামমন্দির নির্মাণের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পর্ক শুধুমাত্র প্রশাসনিক। অর্থনৈতিক কোনও সম্পর্ক নেই। নাগরিকদের ট্যাক্সের টাকায় রামমন্দির তৈরি করা হচ্ছে না। মন্দির নির্মাণে প্রস্তাবিত খরচ ৩০০ কোটি টাকা। কিন্তু মন্দির কমপ্লেক্স তৈরি করতে আরও ১২০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। প্রশ্ন হলো এই বিপুল পরিমাণ অর্থ আসবে কোথা থেকে? মন্দির নির্মাণের দায়িত্ব রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের। ট্রাস্টের উদ্যোগেই সারা দেশে ২৫ নভেম্বর থেকে ২৫ ডিসেম্বর অর্থ সংগ্রহ অভিযান চলবে। অর্থাৎ মন্দির তৈরি হবে মানুষের দানে। বিভিন্ন এনজিও এবং এনআরআই-দের কাছে বড়ো অনুদান আশা করছে ট্রাস্ট। আর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে? না, সহযোগিতা ছাড়া কেন্দ্রের কাছে ট্রাস্টের আর কোনও প্রত্যাশা নেই।

রামমন্দির নির্মাণ উপলক্ষ্যে সারা দেশে এখন সাজো সাজো রব। যাঁরা ভারতবর্ষের সত্যি ইতিহাস জানেন তাঁরা এই জাতীয় আনন্দের অংশীদার। কিন্তু যাঁরা জানেন না বা যাঁদের হাতেই যুগ যুগ ধরে বিকৃত হয়েছে ভারতের ইতিহাস তাঁদের কাছে ভারতীয় জাতিসত্তার পুনরুত্থানের এই প্রয়াস খুব শুভ সংকেত নয়। রামমন্দির নির্মাণের পর বদলে যাবে ভারতের রাজনীতি। সেই বদলে যাওয়া রাজনীতিতে তাঁদের টিকে থাকা শুধু কষ্টকরই নয়, প্রায় অসম্ভব। কারণ দেশবিরোধিতা না থাকলে তাঁদের রাজনীতি শূন্যগর্ভ হয়ে উঠতে বাধ্য।

কংগ্রেস এবং বামপন্থী রাজনীতির ঘোর দুর্দিন বোধহয় আসন্ন।

শিলান্যাস অনুষ্ঠানের মঞ্চে রামমন্দির নির্মাণ ট্রাস্টের অধ্যক্ষ মহন্ত নিত্যগোপাল দাসকে নমস্কার করছেন শ্রীমোদী।

অতিথি কলম

অভিনব কুমার

কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ ভারতের সঙ্গে একসূত্রে বাঁধা তার রূপ নির্ধারণের ভার আমাদের হাতে

২০১৯ সালের ৫ আগস্টের আগে পর্যন্ত সকলেই জানত কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে যা-ই পন্থা নেওয়া হোক না কেন ৩৭০ ধারাকে ছোঁয়া যাবে না। সেই মিথটি চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে ঠিক এক বছর আগে। ৬৯ বছরের আয়ুষ্কালাবধি এই মিথটি (যা এক ধরনের অলঙ্ঘনীয়) কাশ্মীর উপত্যকায় এক বিপজ্জনক স্বপ্ন-কল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে।

ইতিহাসবিদদের কাছে ২০১৯-এর ৫ আগস্ট একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। সংসদে গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে অনেকগুলি সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনার কথা বলেন। একটি জোরালো সংবিধান অনুমোদিত ধাক্কায় স্বাধীনতার সময় থেকে চলে আসা কাশ্মীরের পূর্বতন রাজতন্ত্রের অবস্থানের নিরিখে ভারতীয় সংবিধানের সঙ্গে যে পরম্পরা বিরোধী সম্পর্ক একরকম অলিখিত আইনে পর্যবসিত হয়েছিল তা অপসারিত হয়। একই সঙ্গে রাজনৈতিক, সাংবিধানিক, প্রশাসনিক সমস্ত চালু ব্যবস্থাগুলিও তামাদি হয়ে যায়। এমন ৭ দশক ধরে গেড়ে বসে থাকা একটা ব্যবস্থা রাতারাতি বাতিল হয়ে গেলে সুবিধাভোগীরা কী ধরনের প্রত্যাঘাত করতে পারে, জনগণের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে এ নিয়ে আশঙ্কা ছিল অগাধ। ২০১৬ সালে শ্রীনগর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কী ধরনের হিংসাত্মক বিক্ষোভ হয়েছিল (বুরহান ওয়ানি) সেই আতঙ্ক সকলের মনেই উঁকি দিচ্ছিল। জম্মু-কাশ্মীরের নব গঠিত প্রশাসনিক কাঠামোর প্রশংসা এসূত্রে করা আবশ্যক। বিশেষ করে সব রকমের নিরাপত্তা রক্ষা বাহিনীর সুনিপুণ নেতৃত্বের কারণে একটি বছর পার হয়ে গেলেও শ্রীনগরের রাজপথে বা অন্যত্র একজন সাধারণ নাগরিকেরও মৃত্যু হয়নি। নিখুঁত পরিকল্পনা ও তার সার্থক রূপায়ণের এটি একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হয়ে থাকবে। কোনো বড়ো ধরনের মুখোমুখি সংঘর্ষের খবর পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এধার-ওধার দু' একটি ঘটনায় নাগরিকদের মৃত্যু ধর্তব্যের মধ্যে নয়। অন্তত এ কারণে বিক্ষোভ সম্পর্কিত নয়। শ্রীনগরের রাস্তাঘাটগুলি বহুকাল পরে নিষ্ঠুর পাথররাজদের দাপটে মুক্ত অবস্থান দেখছে। সব চেয়ে বড়ো কথা হলো, সেখানকার হাসপাতালগুলি কাতারে কাতারে নিরাপত্তারক্ষা বাহিনীর 'পেলেট গুলি'তে আহত মানুষের ভিড়ে উপচে পড়েনি।

এবার আসা যেতে পারে ঝড়ের পরে নতুন করে গড়ে তোলার বিষয়ে। এই সূত্রে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশবাহিনীর আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশংসা জরুরি। অনেকেরই এ বিষয়ে চিন্তা ছিল যে উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে পুলিশবাহিনী নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারবে তো? তাঁরা এই ধরনের আশঙ্কাকে অমূলক প্রতিপন্ন করে উপত্যকায় নিরবচ্ছিন্ন শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অসাধারণ দায়বদ্ধতা ও নিষ্ঠার নিদর্শন রেখেছেন। একটি এমন সপ্তাহও পার হয়নি যখন এই নিবেদিত প্রাণ পুলিশবাহিনী জাতির প্রতি দায়বদ্ধতা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। উপর্যুপরি সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণ সফলভাবে প্রতিহত করতে তারা অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। এই গৌরবময় জাতীয় কর্তব্যে সেনাবাহিনীর জওয়ান থেকে অনেক কর্তব্যরত উচ্চপদাধিকারীরাও দেশ সুরক্ষিত রাখতে সন্ত্রাসীদের শিকার হয়েছেন। তাই ভারতীয় সেনাবাহিনী ও অন্য কেন্দ্রীয়

নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ার ক্ষেত্রে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ অতুলনীয় ভূমিকা পালন করেছে। ২০১৯-এর ৫ আগস্টের পর কাশ্মীরবাসীকে শান্তির স্বাদ পৌঁছে দিতে তাদের ভূমিকা কাশ্মীরিরা মনে রাখবেন।

এই সূত্রে সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশ ও বড়ো আকারের সন্ত্রাসবাদী হামলা না ঘটতে দেওয়ার ঘটনাও অন্যতম সাফল্যের তালিকায় থাকবে। ৫ আগস্টের পর সন্ত্রাসবাদীদের ওপর পাকিস্তানের আইএসআই-এর লাগাতার চাপ ছিল বড়োসড়ো সংঘর্ষ, বিক্ষোভ সংঘটিত করার। এমন কিছু করার যাতে ভারত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলার উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাহিনী সর্বদা মজুত থাকায় বিগত কয়েকমাসে কট্টর সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে তারা উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে। এর ফলে প্রতিটি দিনই সন্ত্রাসবাদী ও তাদের পাকিস্তানি প্রভুরা চূড়ান্ত হতাশায় ভুগছে। তার সঙ্গে ৩৭০ ধারা বিলোপের প্রতিশোধ নিতে কিছু না কিছু করে দেখাবার চিন্তায় উন্মাদ হয়ে উঠছে।

এক্ষেত্রে মূল ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরকে ভাগীদার করতে ধারা ৩৭০ তুলে দেওয়া যেমন নিতান্তই জরুরি ছিল তেমনি এর সঙ্গে জড়িত ধামাধরা যে সিস্টেম বলবৎ ছিল তাকে হঠানোও ছিল সমান জরুরি। এরাই তিন দশক ধরে সন্ত্রাসবাদীদের পুষেছে। এর মধ্যে মসজিদ-মাদ্রাসার যুগলবন্দি আবার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এরাই নবীন প্রজন্মকে কট্টর পন্থায় দীক্ষিত করে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে একটা হিংস্র জিহাদি চেহারা দেওয়ার বিশেষ প্রশিক্ষণ দিত। এই মসজিদে উত্তরপ্রদেশ, বিহার থেকে আমদানি করা বিশেষ ধরনের উগ্র মোল্লা আনা হতো যারা কেবলমাত্র ইসলামি জিহাদি প্রচার করে তরুণদের মন বিষিয়ে তুলে ভারত বিরোধী করে তুলত যা কখনই কাশ্মীর উপত্যকার সংস্কৃতির সঙ্গে মেলে না। আমার মনে হয়, এবার সরকার এই মাদ্রাসাগুলিকে অধিগ্রহণ করে সেগুলিকে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে রূপান্তরের কথা বিবেচনা করতে পারে। এর ফলে জিহাদি ভাইরাসের মূলে আঘাত করা হবে। উপত্যকার ছেলে-মেয়েরা আধুনিক শিক্ষা নিয়ে চাকরির উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারবে।

বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মধ্যে আর একটা অহেতুক আশঙ্কা সর্বদা লালিত হতো তা হলো বাইরে থেকে (ভারতের অন্য অংশ) লোক এসে তাদের ওপর আধিপত্য করবে। বসবাসকারী আইনের সাম্প্রতিক পরিবর্তন তীব্র আশঙ্কার জন্ম দেয়। কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রদেশের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বোঝা যায় তাদের এ ধারণা ভিত্তিহীন। ভারতবর্ষের কোনো রাজ্যই কখনও এমন কথা বলেনি যে তাদের জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেল বা নিজস্ব সংস্কৃতি বিপদাপন্ন হয়ে পড়েছে। উলটে এই উপত্যকাই ধর্মীয় বিতাড়নকে প্রথম প্রশ্রয় দেয়। বিপুল হিংস্র উন্মাদনায় হিন্দু কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ঘরবাড়ি কেড়ে নিয়ে তাদের উদ্বাস্তু বানিয়ে দেয়। এই উপত্যাকার কায়েমি স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদরাই বরাবর জম্মু ও লাদাখের জনসংখ্যায় উপত্যকার লোক ঢুকিয়ে সেখানকার জনভারসাম্য নষ্ট করার চেষ্টা করেছে, যাতে উপত্যকার প্রাধান্য চিরস্থায়ী হিসেবে গোটা জম্মু-কাশ্মীরে অন্যায়ভাবে বলবৎ থাকে। এখন অন্য লোক উপত্যকায় আসার সম্ভাবনায় তাদের বুক ফেটে যাচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কাশ্মীরের বিদ্বজ্জন সমাজ (সিভিল সোসাইটি)কেও মানসিকতায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে হবে। দীর্ঘকাল ধরে তারা এক ধরনের কল্পিত অবহেলার শিকার বলে চালিয়ে এসেছেন। এর উলটো পিঠে প্রতিশোধ ফর্মূলা হিসেবে সারা ভারতের লোকেদের মুসলমান বিদ্বেষী বলে চালানোর তত্ত্বে মদত দিয়েছেন। এখন কিন্তু সময় ও সুযোগ দুই এসেছে বিশেষভাবে কট্টরবাদী, ভারত-বিদ্বেষীদের চিহ্নিত করণের। তাদের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে এতদিন ধরে সংঘটিত অপরাধের জন্য আইনানুগ কঠিনতম সাজা দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল বা সরকারি আধিকারিক বা কর্মী যারা সরকারের ঘর থেকে মাইনে নিয়ে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভাবনা পোষণ করেন ও মানুষের মধ্যে প্রচার করেন তাদের এই দ্বৈত ঘৃণ্য ভূমিকা বন্ধ হওয়া দরকার। যারা এই ধরনের ভারত-বিরোধী কাজ সবচেয়ে বেশি করেছে তাদের মধ্যে নিদেনপক্ষে কিছুকে বেছে নিয়ে চাকরি থেকে এখুনি বরখাস্ত করা উচিত। এটা করতে পারলে তবেই উপত্যকায় ভারতের পক্ষে মতবাদ ও সংবেদনশীলতা তৈরি হবে। শ্রীনগরে প্রচারমাধ্যমের কার্যকলাপ কায়েমি স্বার্থান্বেষীদের ও সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে এমনই একসূত্রে বাঁধা যা ভারতবর্ষের কোথাও দেখা যায় না। এর ফলে বাস্তব পরিস্থিতির কোনো সত্য সংবাদই প্রকাশ্যে আসে না।

এ বিষয়ে জাতীয় প্রচারমাধ্যমের তরফে কিছু সংশোধনী ব্যবস্থা নেওয়া আশু প্রয়োজন। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ২০১৮ সালে যে পঞ্চায়েতি প্রক্রিয়া চালু হয়েছিল তাকে আরও শক্তিশালী করা দরকার। আমাদের যদি ভারতের সপক্ষে দীর্ঘমেয়াদে পাকাপাকিভাবে কাশ্মীরবাসীর মানসিকতার পরিবর্তন আনতে হয় তাহলে পঞ্চায়েতের মতো তৃণমূল স্তরে কাজের বিকল্প নেই। মোবাইল যোগাযোগ ব্যবস্থাও উপযুক্তভাবে ফিরিয়ে আনা দরকার। কোনো অঞ্চলে অস্থিরতা, বিক্ষোভ দেখা দিলে সেখানে আবার পরিষেবা প্রত্যাহার করে নেওয়া যেতেই পারে। পরিবর্তনের গতি তো স্তব্ধতায় নয়, তার সাফল্য সচলতায়। সে পথেই চলেছে কাশ্মীর উপত্যকা।

(লেখক আইপিএস অফিসার)

সাম্রাজ্যবাদী চীনের সাত শিকার চতুর চীনকে সাত টুকরো করবে

ডাঃ আর এন দাস

সত্তরের দশকে দেওয়ালভরা স্লোগান ছিল, 'চীনের মাওসেতুং আমাদের চেয়ারম্যান', 'পার্লামেন্ট হচ্ছে শুয়োরের খোঁয়াড়', 'সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা নিপাত যাক' ইত্যাদি। চীনের দাদাগিরি, নৃশংস দমননীতি ও বিস্তারবাদী পরিকল্পনার জন্যই সমগ্র বিশ্বে সে আজ এক দুষ্ট ক্ষতে পরিণত হয়েছে। পাকিস্তান ও উত্তর কোরিয়া ছাড়া চীনের বন্ধু আর কেউ নেই। ভৌগোলিক দৃষ্টিতে দেখলে বিশালাকার চীনের স্থান কানাডা ও রাশিয়ার পরেই। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র গ্লোবাল টাইমসে চীনের ভূয়সী প্রশংসা শুনতে পাবেন। কিন্তু অভ্যন্তরীণ অবস্থা অত্যন্ত করুণ। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, পার্টির অন্তর্কলহ ও সমস্ত প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বিরোধ লেগেই রয়েছে। বেজিং ও সাংহাই ছাড়া অন্য শহরগুলিতে কিন্তু বুলেট ট্রেন, হাই-টেক রাস্তা, স্কাই-স্ক্রেপার বিল্ডিং নেই। সীমান্তবর্তী তাইওয়ান, তিব্বত, পূর্বতুর্কিস্থানের সিনজিয়াং, ইনার মঙ্গোলিয়া, হংকং, মাঞ্চুরিয়া, ম্যাকাউ, গুয়াংসি, নিংসিয়া প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলগুলি চীন গায়ের জোরে কবজা করে রেখেছে। এদের সম্মিলিত আয়তন ৪০ লক্ষ বর্গকিমি যা চীনের মোট আয়তন ৯৭ লক্ষ বর্গকিমির ৪৫ শতাংশেরও বেশি। চতুর্দিকে ১৪টি দেশের সঙ্গে যুক্ত চীনের সীমানা হচ্ছে ২২,১১৭ কিমি দীর্ঘ। আমেরিকান মিলিটারির রিপোর্ট অনুযায়ী, পৃথিবীতে সর্বাধিক সীমান্ত বিবাদগ্রস্ত চীনকে ২৩টি দেশের সঙ্গে সীমানা নিয়ে লড়াই করতে হচ্ছে। ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামের মধ্যবর্তী সাগর যাকে দক্ষিণ চীন সাগর বলা হয়, তা চীনের প্রভুত্বের মধ্যে পড়ে। ইন্দোনেশিয়া ছাড়া অন্য দেশগুলি যেমন, তাইওয়ান, ফিলিপিন্স, ব্রুনেই, মালয়েশিয়া ও ভিয়েতনাম— সবাই এই সমুদ্রের মালিকানা পেতে চায়। তাই এই সাগরাঞ্চল যুদ্ধের ময়দান হয়ে উঠেছে।

১৯৪৯ সালে চীনের কমিউনিস্ট সরকার গড়ার পর থেকেই বিস্তারবাদী চীনের জমি-জিহাদ শুরু হয়ে যায়। বাঙ্গালি হিন্দুরা সিপিএমের 'ভেস্ট করে জমি দখলদারির' শিকার হননি এমন লোক খুব কমই আছেন। চীনের মানচিত্রে স্পষ্ট দেখা যায়, এক সময়ের ৯টি স্বাধীনদেশ আগ্রাসী ড্রাগনের করালগ্রাসে পড়ে তাদের সার্বভৌমত্ব হারিয়েছে। এছাড়াও বহু দেশ আছে যাদের জমি আজও চীন জবরদখল করে রেখেছে। সংক্ষেপে বলা যায় কীভাবে অতীতে চীন ওইসব এলাকা দখল করেছিল।

দক্ষিণ বা ইনার মোঙ্গলিয়া : মধ্যযুগে চীনের উপর মোঙ্গলিয়ার শাসন জারি ছিল। মোঙ্গলিয়ার মোট আয়তন ১১.৮৩ লক্ষ বর্গকিমি ও জনসংখ্যা প্রায় ২.৫ কোটি। চীনের উত্তর সীমান্তে মোঙ্গলীয়দের নৃশংস আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য মিং রাজবংশ ১৩৬৮-১৬৪৪ পর্যন্ত চীনে দুর্ভেদ্য প্রাচীর নির্মাণ করায়। সময়ের অন্তরালে চেঙ্গিস খানের নাতি কুবলাই খানের রাজত্বের পর মোঙ্গালিয়া দুর্বল হয়। এক সময় মোঙ্গালীয়রাই চীনাদের কাছে সাহায্য নিত। চীন দক্ষিণ মোঙ্গালিয়ার অনেকাংশ দখল করে 'হান চীনা'দের বসতি স্থাপন করে স্থানীয় মোঙ্গালীয়দের তাড়িয়ে দেয় যেমনটি করেছে তিব্বতে বা অন্য প্রদেশগুলিতে। চীনে ১৯১১ সালে কুইং রাজবংশের পতনে উত্তর মোঙ্গেলিয়ার বিপ্লবীরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান চীনকে আক্রমণ করলে মোঙ্গালিয়া বিধ্বস্ত হয়। সোভিয়েত রাশিয়া জাপানকে পরাজিত করলে স্তালিনের নির্দেশে চিয়াং কাইসেক আউটার মোঙ্গলিয়াকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান

করে। কিন্তু মাওসেতুঙ্গের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট চীন চিয়াং কাইসেককে তাইওয়ানে তাড়িয়ে দিলে উত্তর মোঙ্গলিয়া আবার স্বাধীনতা হারায়। এখন চীনের অধীনতা অস্বীকার করে অধিকৃত ইনার (দক্ষিণ) ও আউটার (উত্তর) মোঙ্গলিয়ার দুই অংশ সম্মিলিত হয়ে এক স্বাধীন মোঙ্গলিয়া দেশ হতে চাইছে।

গুয়াংসি : ভিয়েতনাম সংলগ্ন চীনের দক্ষিণে অবস্থিত এই দেশটির আয়তন ২.৩৭ লক্ষ বর্গকিমি। জনসংখ্যা ৪৮ মিলিয়ন। রাজধানী ন্যানিং। চীনের ফিং রাজবংশ এই প্রদেশকে ১৭২৬ সালেই স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিয়েছিল। ফিং রাজবংশের অবলুপ্তিতে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত বিপ্লবের আগুন জ্বলতে থাকা গুয়াংসির বিপ্লবীরা ১৯১১ সালে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু ১৯২৯ সালে দেং জিয়াও পিং-এর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি দাঙ্গার মাধ্যমে দখল করে নেয় এই দেশটিকে। গত কয়েক দশকের গৃহযুদ্ধে ক্লান্ত বিদ্রোহীদের সহজেই দমন করে চীন গুয়াংসিকে স্বশাসিত প্রদেশের অধিকার দিয়ে এখনও কবজা করে রেখেছে। এখানকার মূল অধিবাসীরা ছিল ঝুয়াং কিন্তু হান চীনারা তাদের তাড়িয়ে এখন সংখ্যালঘু বানিয়ে দিয়েছে।

সিনজিয়াং : চীনের উত্তরপশ্চিমে মরুভূমি ও পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত স্বায়ত্তশাসিত এই প্রদেশের আয়তন ১৬.৬ লক্ষ বর্গকিমি। এখানকার উইঘুর মুসলমানদের জনসংখ্যা মাত্র ২.২ কোটি। আসলে এটা পূর্ব তুর্কিস্থানের একটা অংশ ছিল। তুর্কী ও মোঙ্গলিয়ার বর্ণসংকর হচ্ছে ইউঘুর মুসলমান। চীনের অধিবাসী না হওয়ার কারণে তারা চীনের আধিপত্য অস্বীকার করেছে। অশান্তির মূলাধার এখানেই। ইন্দো-ইরানি সভ্যতার সঙ্গে এদের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। মধ্যযুগে চীন ও ভারত মধ্যএশিয়ার আরব দেশগুলিতে বাণিজ্য করতো সিন জিয়াং-এর সিল্ক-রুট দিয়েই। মানবাধিকার উল্লঙ্ঘনের কারণে বর্তমানে আমেরিকাও চীনের উপর আর্থিক প্রতিবন্ধ লাগিয়ে সংসদে বিল পাশ করিয়েছে।

তিব্বত : বিস্তারবাদী চীন ১৯৫১ সালে তিব্বতকে গ্রাস করে। অন্যথায় তিব্বত আজ পৃথিবীতে তৃতীয় বৃহত্তম দেশ হতো। পৃথিবীতে ২৯০২৯ ফুটের সর্বোচ্চ পর্বত এভারেস্ট এখানেই আছে। ভারত ও চীনের মধ্যে বাফার স্টেট হতো তিব্বত এবং চীনের সঙ্গে ভারতের কোনো সীমান্ত বিবাদও থাকতো না। দূরদৃষ্টিহীন নেহরু এটা বুঝতে পারেননি। চীন ২.৫ মিলিয়ন বর্গকিমি আয়তনের এই বিশাল তিব্বতকে দুটি ভাগে ভাগ করেছে। উত্তর দিকে নেপাল ও ভারতের লাদাখ সংলগ্ন অংশের নাম জিদং। রাজধানী লাসা এখানেই আছে। হিমালয় সংলগ্ন কুইনাইন প্রদেশ চীনের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত। হান ও হুই চীনাদের এখানে এনে জোর করে বসানো হচ্ছে। বলপূর্বক ১৪ থেকে ৪০-এর তিব্বতীয় যুবতীদের বন্ধ্যা করে দেওয়া হচ্ছে। নির্বাসিত ১৪তম বৌদ্ধধর্মগুরু দলাই লামা আজ হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালায় 'স্বাধীন তিব্বত' সরকার গঠন করে সারাবিশ্ব চষে বেড়াচ্ছেন স্বাধীনতা আদায় করার জন্য। আমেরিকার কংগ্রেস প্রতিনিধি স্কট পেরি-সহ ৩২ জন সাংসদ সম্প্রতি তিব্বতের স্বাধীনতার জন্য সংসদে বিল পাশ করিয়েছেন।

মাঞ্চুরিয়া : উত্তরপূর্ব চীন মোঙ্গলিয়ার মধ্যে অবস্থিত ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সম্রাট হিরোহিতোর জাপানি উপনিবেশ। এই দেশটির আয়তন ১২ লক্ষ বর্গকিমি। জনসংখ্যা ৪৩ মিলিয়ন। সংখ্যাগরিষ্ঠ হানচীনাদের মান্ডারিন ছাড়াও জাপানি, মাঞ্চু ও মোঙ্গালীয় ভাষার চলন আছে। প্রধান ধর্ম শিন্টো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হলে ১৯৪৫ সালে সোভিয়েত রাশিয়া জাপানের কাছ থকে মাঞ্চুরিয়াকে ছিনিয়ে নিয়ে কমিউনিস্ট চীনের হাতে সঁপে দেয়। সেই মাঞ্চুরিয়া আজ স্বাধীনতা চাইছে চীনের অধিকার অস্বীকার করে।

হংকং : আয়তনে এই দ্বীপ ১,১০৪ বর্গকিমি। জনসংখ্যা মাত্র ৭৫ লক্ষ। এখানেও হান সম্প্রদায়ের চীনারা থাকতো। ব্রিটিশদের উপনিবেশ ছিল। ১৯৪৮ সালে টনি ব্লেয়ার 'এক দেশ দুই শাসন প্রণালী'র দ্বারা আন্দোলন প্রশমিত করেছিলেন। কিন্তু ১৯৯৭ সালে চীনের দখলে পুরোপুরি চলে এলেও প্রতিরক্ষা এবং স্বায়ত্তশাসনের ভার আগামী ৫০ বছরের জন্য 'সেন্ট্রাল পিপল' সরকারের হাতেই আছে। হংকংয়ের নিজস্ব বিধানসভা, আইন ও সীমানা আছে। ২০১৭-তে নির্বাচিত মহিলা মুখ্য কার্যনির্বাহীর নাম কেরি লাম। এখানে ২০১৪ সালে ৭৯ দিনের 'ছাতা আন্দোলনে' ক্যান্টোনিজরা চীনের প্রভুত্ব অস্বীকার করে। পুতুল-সরকার আন্দোলনকারীদের উপর জঘন্য অত্যাচার চালায়। একনায়কতন্ত্রী কমিউনিস্ট চীন থেকে মুক্তির কামনায় সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জে মাঞ্চুরা আবেদন করেছেন।

তাইওয়ান : চীনের কবজা করা ৩৬ হাজার বর্গকিমি ও ২ কোটি ৩৭ লক্ষ জনসংখ্যার দেশ তাইওয়ানের যা চীনের সমুদ্রসীমা থেকে ১০০ কিমি দূরের একটা দ্বীপ। রাজধানী তাইপেই। রাষ্ট্রপতি, মুদ্রা, সীমানা এবং আইনব্যবস্থা নিজেদের হলেও আজও এই দেশ 'পিপলস রিপাবলিক অব চায়নার' অধীনে। ১৯৪৯ সালে মাওসেতুং ক্ষমতা দখল করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা তাইওয়ানের উপর নিজের প্রভুত্ব জারি করে। চিয়ং কাইসেক এই দ্বীপেই পালিয়ে আসেন। ১৯৫০ সালে আমেরিকার বিখ্যাত যুদ্ধজাহাজ 'সেভেন্থ ফ্লিট' দক্ষিণ চীনসাগরের পাহারাদারি শুরু করে। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার তাইওয়ানের সঙ্গে রক্ষাসন্ধিতে স্বাক্ষর করেন। সেই জন্য প্রেসিডেন্টকে তাইওয়ানের 'রক্ষাকর্তা' বলা হয়। সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনের আগে তাইওয়ানের সদস্যতা ছিল। কিন্তু সেই সদস্যতাকে খারিজ করে চীনকে ১৯৭১ সালে দেওয়া হয় এবং তাইওয়ানকেই চীনের অভিন্ন অংশ বলে মান্যতা দেওয়া হয়। ভারত ও আমেরিকা এখন তাইওয়ানকে নতুন স্বতন্ত্র দেশ হিসেবে মান্যতা দিচ্ছে।

ম্যাকাউ : ১১৫ বর্গকিমি আয়তন ও সাত লক্ষ জনসংখ্যার ছোট্ট এক দেশ যা চীনের 'ম্যাকাও স্পেশাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অঞ্চল' বলেও পরিচিত। ব্রিটিশরা যেমন হংকংকে উপনিবেশ বানিয়েছিল পোর্তুগিজরাও বিগত ৪০০ বছর ধরে ম্যাকউকে কবজা করেছিল। হংকং-এর মতো

একই পদ্ধতিতে, 'এক দেশ দুই শাসন ব্যবস্থার' নীতি প্রয়োগে ১৯৯৯ সালে চীনের দখলে চলে আসে ম্যাকাউ। শর্ত ছিল, প্রথম ৫০ বছর স্বশাসন, কিন্তু তারপর কমিউনিস্ট চীনের লৌহকঠিন শাসন। কিন্তু হংকং-এর মতোই এখানকার জনগণ কমিউনিজমের জায়গায় ডেমোক্রেসি চায়। চীনের লাস ভেগাস এবং এশিয়ায় ইউরোপের শেষ উপনিবেশ ম্যাকাউ কুখ্যাতি অর্জন করেছে তার বেআইনি ক্যাসিনো, গণিকাবৃত্তি, জুয়া ও মদের কারণে। দারিদ্র্য ও বেকারিত্ব চরম। ন্যূনতম বাকস্বাধীনতা ও মানবাধিকার নেই। আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে চীনের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ও নির্ভরশীল বলেই বিদ্রোহ এতদিন দানা বাঁধেনি। চীনা সরকার অকথ্য অত্যাচারের দ্বারা সমস্ত ডেমোক্র্যাটিক ও ক্যাপিটালিস্টিক মতাদর্শকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু কতদিন দমননীতি চালাতে পারবে সেটা ভবিষ্যতই বলবে।

নিংসিয়া : চীনের উত্তরপশ্চিমে দক্ষিণ মোঙ্গলিয়া সংলগ্ন এই দেশ ৬৬,৪০০ বর্গকিমির ঊষর মরুভূমি। ৬৮ লক্ষ জনসংখ্যা। ভারতীয় ছাত্ররা এখানে ডাক্তারি পড়তে আসে। এখানে ৬২ শতাংশ হান ও ৩৮ শতাংশ হুই সম্প্রদায়ের মুসলমান চীনাদের বাস। এই প্রদেশ কখনই চীনের মূল ভূখণ্ডের মধ্যে ছিল না। প্রতিবেশী মোঙ্গলিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় চীনা সৈন্যরা এখানে বিশ্রাম করতো মাত্র। ১৯৫৪ সালে চীন এই দেশকে পুরোপুরি কবজা করলে জনগণ অধীনতা অস্বীকার করে তীব্র আন্দোলন শুরু করে। কঠোর দমনপীড়নের সাহায্যে বিদ্রোহ দমন করে। ১৯৫৮ সালে কমিউনিস্ট সরকার এই অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর করে।

নেপাল : এখন চীন নেপালের জমিও অধিকার করতে চাইছে। তিব্বতে সড়ক যোজনার অছিলায় চীন নেপালের লিপুলেক, কালাপানি ও লিম্পুনদুয়ারে ৩৩ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করে রেখেছে।

ভারত : আকসাই চীন ও কারাকোরাম উপত্যকায় ৪১,১৮০ বর্গকিমি দখল করে রেখেছে চীন ১৯৬২ সালের যুদ্ধে। মোদীর কথায়, 'এখন আর বিস্তারবাদের যুগ নেই, এখন বিকাশের যুগ'। চীনের ভিতরের খবর দুর্ভেদ্য লৌহপর্দা ভেদ করে আসা প্রায় অসম্ভব। তবুও জানা গেছে, মানবাধিকার উল্লঙ্ঘন ও বেকারত্ব, পার্টির মধ্যে দলাদলিতে চীনের সাত টুকরো হবার সম্ভবনা প্রবল হয়ে উঠেছে। শুধু অপেক্ষা করছে বহির্বিশ্বের সমর্থনের। আর্থিক সংকটের চপেটাঘাতে চীনও কুপোকাত। করোনা মহামারীর কারণে ৩০০ বহুজাতিক সংস্থা এবং তাদের আনুষঙ্গিক সহযোগী ৫৫০টি কোম্পানি চীন ছেড়ে ভারতে আসতে চাইছে। সরকারি দমননীতির কথা সারাবিশ্ব জানে। বিখ্যাত চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট এস গুরুমূর্তির কথায় ২৫০ বছর আগেও চীন ও ভারতের সম্মিলিত জিডিপি সারাবিশ্বে ৭৫ শতাংশ ছিল তার মধ্যে ভারতের একারই ছিল ৩৪ শতাংশ। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র গ্লোবাল টাইমস গোয়েবলসীয় কায়দায় সত্যকে মিথ্যার মোড়কে পরিবেশন করছে। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে জনগণ এখন আসল সত্যের সন্ধান পেয়ে যাচ্ছে অনতিবিলম্বেই। তাই চীনে টুইটার, ইউটিউব, গুগ্‌ল নিষিদ্ধ। শি জিনপিং এখন আর আগের মতো মানুষের আন্দোলনকে রোধ করতে পারছেন না। চীন অপরাজেয় নয় এটা ভারত বারবার প্রমাণ করে দিয়েছে। ১৯৬৭ সালে চীনের বড়ো পরাজয় হয় ভারতীয় সৈন্যের হাতে। কিন্তু চীনা জনগণকে তা জানতে দেওয়া হয়নি। গত ১৬ জুন লাদাখে ভারতের ২০ জন জওয়ান বীরগতিপ্রাপ্ত হয়েছে জানা গেছে, কিন্তু চীন সরকারি ভাবে নিজেদের হতাহতের সংখ্যা প্রকাশ করতে ভয় পাচ্ছে। এএনআই-এর মতে ভারতীয় জওয়ানদের প্রত্যাঘাতে ৪৫ জন চীনা সৈন্য মারা গেছে।

পরিশেষে বলা যায়, চীনের বলকানাইজেসন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির তিন যুযুধান উপদল— জিয়াং জেমিনের নেতৃত্বে সাংঘাই, হুজিন-তাও-এর বেজিং ও প্রেসিডেন্ট সি জিনপিং-এর নিজস্ব ঝেনজিয়াং উপদলই নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে শেষ হবে। দেশে ডেমেক্র্যোসি আসবে এবং স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলগুলি পরাধীনতার গ্লানিমুক্ত হয়ে স্বাধীনতার আস্বাদন পাবে। ■

হ্যাঁ ! আমরাই আপনাকে দিতে পারি
এক উন্নতমানের পরিষেবা
কারণ
আমাদের কাছ থেকে আপনি পাবেন

MUTUAL FUNDS Sahi Hai

OUR PRODUCTS	OUR PLANNING
❖ Portfolio Management Services	❖ Retirement Planning
❖ Mutual Fund	❖ Pension Fund
❖ Life Insurance	❖ Children Education Fund
❖ General Insurance	❖ Daughter Marriage Fund
❖ Mediclaim	❖ Estate Creation
❖ Accidental Insurance	❖ Wealth Creation
❖ Company Bond & Fixed Deposit	❖ Tax Planning

মিউচুয়াল ফাণ্ডে SIP করুন
(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

২০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা
১৯৯৬ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত
SIP তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন
তাদের প্রত্যেকের ফাণ্ড ভ্যালু বর্তমানে ১ কোটি টাকা
২০ বছরে মোট বিনিয়োগ ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা মাত্র

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
Find us on Facebook
E-mail : drsinvestment@gmail.com

মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

অখণ্ড ভারত কোনো অলীক কল্পনা নয় : একটি বাস্তবতা

রুদ্রপ্রসাদ

আজকের এই ভারতবর্ষ প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে বর্ণিত ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড ভারতবর্ষ নয়। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে চাণক্য রচিত অর্থশাস্ত্র থেকে অখণ্ড ভারতের রূপ আমরা অনুধাবন করতে পারি। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে আজকের আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বার্মা, তিব্বত, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, এই আধুনিক দেশগুলো ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

চাণক্য একটি অখণ্ড ভারতের ধারণা প্রকাশ করেছিলেন। তার পরিকল্পনা ছিল খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সমস্ত গণরাজ্য এক কর্তৃত্ব, শাসন এবং প্রশাসনের অধীনে আনা। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, নেপাল, বার্মা, তিব্বত, ভুটান, বাংলাদেশ, ভারত-এই আধুনিক দেশগুলো খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অনেকগুলি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। চাণক্য চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে মৌর্য সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসতে সহযোগিতা করেন। তারপর অখণ্ড ভারত গঠনের পরিকল্পনায় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে পরামর্শ ও নেতৃত্ব দেন। যুদ্ধ, বুদ্ধি এবং জোটের মাধ্যমে খণ্ড খণ্ড রাজ্যগুলিকে নিয়ে তার এই অখণ্ড ভারত গঠনের প্রয়াস অনেকাংশে সফল হয়েছিল। যদিও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পতনের পর অস্থিরতা দেখা দেয় এবং অখণ্ড ভারত গঠনের পরিকল্পনা ব্যাহত হয়। মুঘল আগ্রাসনের সময় অনেকগুলি রাজপরিবার তাদের ক্ষমতা সমর্পণ করলেও রাজপুত ও মারাঠাদের মতো অনেক ভারতীয় রাজা লড়াই জারি রেখে মুঘল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। অর্থাৎ অখণ্ড ভারত গঠনের স্বপ্ন কোন নতুন ধারণা নয়—এই ধারণা ভারতের অতীতের আদর্শ।

ব্রিটিশদের ভারত আগমনের ফলে ভারতবর্ষে নিদারুণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ব্রিটিশরা ভারতের ইতিহাসকে চিরতরে বদলে দেয়। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ থেকে শিক্ষা নিয়ে ব্রিটিশরা ধর্মের ভিত্তিতে ভারতকে ভেঙে দেওয়ার পরিকল্পনা করে। 'বিভাজন এবং শাসন' এহেন হুমকি কখনো আলোচনার মাধ্যমে ভারতের প্রতিটি রাজ্যকে আক্ষরিক অর্থেই ব্রিটিশ শাসনাধীন নিয়ে আসে। ভবিষ্যতে এই রাজ্যগুলোর একত্রীকরণের প্রতিরোধে ব্রিটিশরা দেশীয় রাজ্যগুলোর পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে মতপার্থক্য সৃষ্টি করে একের বিরুদ্ধে অন্যকে শত্রুতে পরিণত করেছিল। অর্থাৎ ঐক্যবদ্ধ ভারতের সম্মুখে একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ হাজির করেছিল। অনেক বলিদানের ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭ সালে খণ্ডিত ভারত তার স্বাধীনতা ফিরে পায়।

হিন্দু মহাসভার নেতা বিনায়ক দামোদর সাভারকর একটি অখণ্ড ভারত ও একটি অখণ্ড হিন্দু রাষ্ট্রের ধারণা প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি সমস্ত হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন এবং শিখদের ভারতীয় উপমহাদেশ কাশ্মীর থেকে রামেশ্বর এবং সিন্ধু থেকে অসম সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এব রাজনৈতিক ঐক্যের উপর জোর দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক এবং ভারতীয় জনসঙ্ঘের নেতা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় অখণ্ড ভারতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, ''অখণ্ড ভারত শব্দটিতে জাতীয়তাবোধের সমস্ত মূল মূল্যবোধ এবং একটি অবিচ্ছেদ্য সংস্কৃতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অখণ্ড ভারত শুধুমাত্র একটি ধারণা নয়, এটি একটি সুচিন্তিত নির্ধারিত লক্ষ্য। যারা অবিচ্ছেদ্য স্তম্ভ হিসাবে বিভাজনকে বিবেচনা করে তারা সকলেই বিপথগামী ও বিভ্রান্ত হয়। এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি কেবলমাত্র মাতৃভূমির প্রতি দায়বদ্ধতা ও ভালবাসার অভাবের প্রতিফলকে বোঝায়। অটক থেকে কটক, কুচ থেকে কামরূপ এবং কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত পুরো ভূভাগ জন্মভূমি। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ শুধুমাত্র আমাদের জন্মভূমি নয়, এই সমগ্র অঞ্চল আমাদের পবিত্র ভূমি। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এখানে জন্মগ্রহণ এবং কালক্রমে বসবাস করেছেন। এই ভূমি আমাদের চরম পবিত্র ভূমি। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী ১৯৪৯ সালের ২৪ আগস্ট দিল্লিতে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানকে একটি 'অনিশ্চিত দেশ' আখ্যা দিয়ে বলেছিলেন, ''বিভাজন যদি নিষ্পত্তি হয় তবেই আমরা তা নিষ্পত্তি করতে এখানে এসেছি। বাস্তবে এই বিশ্বে 'স্থির সত্য' বলে কিছু নেই। মানুষের ইচ্ছার দ্বারা বিষয়গুলো নিষ্পত্তি বা অমীমাংসিত হয়ে থাকে। যদি কোনো মানুষ নিজের ইচ্ছাকে উৎসর্গ করার মনোভাব দ্বারা চালিত করেন, তবে তিনি নিজেকে ধার্মিক ও গৌরবান্বিত করতে পারেন।''

আমাদের রাজনৈতিক পরিচয় আলাদা হলেও ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশের বসবাসকারী সমস্ত মানুষ একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। দেশভাগের ফলস্বরূপ আমরা কেউ লাভবান হতে পারিনি। বরং আমাদের শক্তি ক্ষয় হয়েছে। যদি আজকে অখণ্ডভারত বিরাজমান থাকতো, তাহলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তিধর দেশ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারত, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারতো। অখণ্ড ভারতের ধারণা না থাকলে মহাভারত নামে কোনো মহাকাব্য রচিত হওয়া সম্ভব ছিল না। মহাভারতে সমস্ত ভারতীয় রাজাদের জড়িয়ে রেখেছে। ভারতবর্ষ বা আর্যাবর্তের ধারণা প্রাচীন গ্রন্থগুলি থেকে আমরা পাই। প্রাচীন গ্রন্থগুলি থেকে আমরা জানতে পারি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী, গান্ধার থেকে ব্রহ্মদেশ হলো অখণ্ড ভারত। মহাভারত থেকে আমরা জানতে পারি, গান্ধার থেকে আগত ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী গান্ধারী (বর্তমান আফগানিস্তানের কান্দাহার), পাঞ্চালের দ্রৌপদী (বর্তমান জম্মু ও কাশ্মীর), পূর্বে মণিপুরের চিত্রাঙ্গদা, নাগাভূমির রাজকন্যা উলুপী —এই মজার বিষয়গুলো।

রামায়ণে একইভাবে অযোধ্যা থেকে রামেশ্বর পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণের যোগসূত্রটি বর্ণনা করা আছে। যেখানে লঙ্কার (বর্তমানে শ্রীলংকা নামে পরিচিত) উল্লেখ করা আছে। অর্থাৎ

রামায়ণের কাহিনি বর্ণনাকারীদের ভারতবর্ষকে সাংস্কৃতিকভাবে অন্তঃসংযোগ সত্তা হিসাবে ধারণাটি বর্তমান ছিল। এখানে উত্তরাঞ্চলের তিরুপতি এবং দক্ষিণাঞ্চলের কুম্ভ মেলার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভক্তি আন্দোলনের শিকড় দাক্ষিণাত্যের তামিল ও কানাড়া ভাষায়ও ছিল। রাজ্যগুলির সীমা পরিবর্তন হয়ে গেলেও ভারতবর্ষ জুড়ে প্রচুর সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐক্য অব্যাহত ছিল। ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্য আমাদের অবাক করে দেয়। আমরা দেখতে পাই, যখন দক্ষিণে শিব ভক্তির জন্য মহান আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তখন কাশ্মীরের শৈবধর্মের ভ্রান্ত দর্শন উত্তরে বিকাশ লাভ করেছিল। দক্ষিণের কবি কুম্বন প্রথম রামকাহিনিকে প্রধান আঞ্চলিক ভাষায় নিয়ে গিয়েছিলেন। এর বহু পরে তুলসীদাসের আন্দোলন শুরু হয়। ভক্তি আন্দোলন আমাদের প্রাচীন কাহিনিগুলিকে সংস্কৃত ভাষা থেকে সাধারণ মানুষের ভাষায় অর্থাৎ আঞ্চলিক ভাষায় ফিরিয়ে দিয়েছিল। বাংলা , মারাঠি, অবধি (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ), ভোজপুরি (বর্তমান বিহার), গুজরাটি, পাঞ্জাবি, রাজস্থানি ভাষায় বিভিন্ন দর্শন ও মহাকাব্যগুলি রচনা হতে থাকে। চৈতন্যদেব যখন বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার করছিলেন তখন তুকারাম বিঠলদেবের কীর্তন করছিলেন। ভারতীয় উপাসনার জগতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রূপে, যথা—রাম, কৃষ্ণ, জগদম্ব, বেঙ্কটেশ্বর, দুর্গা বা কালী রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কোনো ধর্মীয় নির্দেশ ছাড়াই এই সাধারণ কাহিনিগুলি ভারতবর্ষ জুড়ে সাংস্কৃতিক তথা ধর্মীয় ঐক্যের সূচনা করেছিল। সপ্তম থেকে দশম শতাব্দীতে তামিল সংস্কৃতির ঐতিহ্যের প্রচার আলবার এবং নায়নারদের সাথে শুরু হয়েছিল, যা দ্বাদশ শতাব্দীতে নেতৃত্বে দিয়েছিলেন কামবান। দ্বাদশ শতাব্দীতে কন্নরে বসবেশ্বর, পঞ্চদশ শতকে বঙ্গদেশে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, রামানন্দ; ষষ্ঠদশ শতকে রসখান, ব্রজমণ্ডলে সুরদাস, রাজস্থানে মীরাবাঈ, পাঞ্জাবে তুলসীদাস, নানক এক সাংস্কৃতিক ঐক্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিলেন।

ভারতবর্ষের পবিত্র ভূমিতে এই সাংস্কৃতিক ঐক্যের ধারণাটি শঙ্করাচার্যকে বেদান্তের রহস্য উদ্‌ঘাটনে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। এই পবিত্র ভূমি যদি দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদানে যুক্ত না থাকতো তাহলে শঙ্করাচার্য কখনোই দেশব্যাপী ভ্রমণ করতেন না। পশ্চিমে দ্বারকা (গুজরাটে), পূর্বে পুরী (ওড়িশায়), উত্তরে বদ্রীনাথ (উত্তরাঞ্চল) ও দক্ষিণে (কর্ণাটক) মঠ স্থাপনের জন্য উৎসাহিত হতেন না। শঙ্করাচার্য কাশ্মীরের শ্রীনগরে (শ্রী বা শক্তির বাসস্থান) গিয়েছিলেন। হাজার বছরের বেশি আগের ভৌগোলিক তথা সাংস্কৃতিক ঐক্যের বেঁচে থাকার একটি সুনিদর্শন।

আমরা ভক্তি ও বেদান্ত এবং রামায়ণ-মহাভারতের সম্পর্কে আলোচনা করেছি। ঐক্যের এই ধারণাগুলো আমাদের বিভিন্ন বিস্তৃত দর্শনকে ঘিরে রেখেছে। তন্ত্রবিদ্যা জনপ্রিয় উপাসনার উপর এক বিরাট প্রভাব পড়েছিল। বর্ণিত হয়েছে ৫১টি শক্তিপীঠের স্থান মাহাত্ম্য। অসমের কামাখ্যা মন্দির, গুজরাটের পাবাগড়, জম্মুর বৈষ্ণোদেবী থেকে তামিলনাড়ুর নীলাদীক্ষি সহ মোট ৫১টি জায়গায়। এই গল্পগুলি প্রকৃত বা প্রতীকী যাই হোক না কেন, তাদের কাছ থেকে এটা পরিষ্কার যে এই গল্পগুলো যারা বলেছিলেন এবং যারা শুনেছিলেন তাদের মনে ভারতবর্ষের ধারণা বিদ্যমান ছিল। মানব বন্ধনের গল্পে অন্যান্য সংস্কৃতিতে অভিবাসন, বিবাহ এবং ধারণাগুলির বিনিময়ের পাশাপাশি এই সমস্ত গল্পগুলি আমাদের একত্রে আবদ্ধ করেছে।

ভারতের ধারণাটি ভারতীয় উপমহাদেশে অবস্থিত একটি সভ্যতা। ভারতের বিশাল অংশগুলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেন্দ্রীভূত শাসনের অধীনে ছিল। সত্য প্রকাশের পরিবর্তে এই তথ্যগুলো ততক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা আমাদের দেশের ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় অনুধাবন করতে পারব, আমরা নিছকই একটি দেশ নই; আমরা একটি সুসভ্য রাষ্ট্র। পৃথিবীর অন্যতম দেশগুলির মধ্যে অন্যতম।

ভারতবর্ষ খণ্ডিত স্বাধীনতা লাভের পর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল খণ্ডবিখণ্ড ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য একটি সংযুক্ত ভারতের ধারণা দিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত ১৯৫০ এর দশকের গোড়ার দিকে সেই উদ্দেশ্য পূরণ করেন। তবে একসময় যে ভারত ছিল, সেই অখণ্ড ভারত তা নয়। চাণক্য স্পষ্টভাবে অখণ্ড ভারত বলতে বুঝিয়েছেন, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া এবং এমনকী ইন্দোনেশিয়ার কিছু অংশ একই শাসনতান্ত্রিক ও প্রশাসন ব্যবস্থার অধীনে ছিল। এই অঞ্চলগুলির সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী হিন্দু ধর্ম পালন করত। আনুষ্ঠানিকভাবে বৌদ্ধ হলেও থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, বার্মার মতো অনেকগুলো দেশে হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান করছে। মালয় লোককাহিনীতে বিদাডারী, জেন্টায়ু, গরুড় এবং নাগা জাতির প্রচুর ভারতীয় প্রভাবিত প্রাচীন চরিত্র রয়েছে। ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ডের ধ্রুপদী নৃত্য-নাটক রামায়ণ ও মহাভারতের পর্বগুলি থেকে গল্প নিয়েছিল। ফিলিপাইনের পৌরাণিক কাহিনিতে পরমেশ্বর দেবতা বাখালা এবং দেওয়াতার ধারণা এবং কর্মের উপর বিশ্বাসগুলি হিন্দু- বৌদ্ধ ধারণার দ্বারা উৎপন্ন স্থাপত্য-ভাস্কর্য এবং একই ধরনের হিন্দু মন্দিরের স্মৃতিস্তম্ভ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশ কয়েকটি মন্দিরে ব্যবহৃত হতো। যা উৎসর্গীকৃত হিন্দু দেবতা বিষ্ণুর কাছে। ইন্দোনেশিয়ার মধ্য-জাভাতে প্রাম্বানন ত্রিমূর্তি উৎসর্গিত হয়েছে ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং মহেশ্বরকে। ইন্দোনেশিয়ার মধ্য-জাভাতে বোরোবুদুর বিশ্বের বৃহত্তম বৌদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ। এই স্তূপগুলির সঙ্গে মুকুটযুক্ত একটি বিশালাকার পাথর মান্ডালা আকার নিয়েছিল। পূর্ববর্তী এই ঐতিহ্যের সহেগ ভারতীয় বংশোদ্ভূত বৌদ্ধ ধারণার সংমিশ্রণ রয়েছে। পঞ্চদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীতে ইন্দোনেশিয়ার মসজিদগুলির সঙ্গে হিন্দু মন্দিরগুলির সাদৃশ্য রয়েছে। মালয়েশিয়া বাট গুহাগুলি ভারতের বাইরে অন্যতম জনপ্রিয় হিন্দু মন্দির। ব্রহ্মাকে উৎসর্গীকৃত ইরান শ্রীণ থাইল্যান্ডের অন্যতম জনপ্রিয় ধর্মীয় মন্দির।

আমাদের রাজনৈতিক পরিচয় আলাদা হলেও ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশে বসবাসকারী সমস্ত মানুষ একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। দেশভাগ আমাদের কাউকেই লাভবান করে তোলেনি, বরং আমাদের শক্তিক্ষয় হয়েছে। তাই ভারতবর্ষ যদি অখণ্ডরূপে বিরাজমান থাকত তবে বিশ্বের একক শক্তিধর দেশ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারত এবং বিশ্ব শান্তির নির্মাতা হতো। তবে আমরা আশাবাদী, নিকষকালো অন্ধকার ভেদ করে যেমন পূর্ব দিকে সূর্য উদয় হয়, তেমন করেই ভারতবর্ষ আবার,অখণ্ডরূপে জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন নেবে। তাই, ঋষি অরবিন্দ ঘোষের সেই অমোঘ বাণীই আমাদের স্বপ্ন—"আমি পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি যে ভারতমাতা পুনরায় একত্রিত হবার পরে বিশ্বগুরুর আসনে আবার সিংহাসন প্রাপ্ত হবে।"

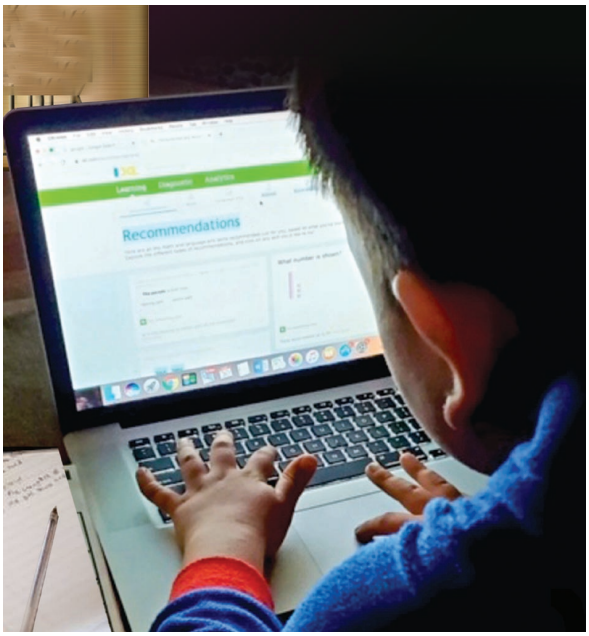

অনলাইনে শিক্ষার সমস্যা ও সমাধান চিন্তা

বিমলকৃষ্ণ দাস

দীর্ঘদিন অনলাইন শিক্ষার কারণে শিক্ষার্থীর মধ্যে সৃষ্টি হতে চলেছে নানা সমস্যা। তাদের মধ্যে এমন উদ্ভূত সমস্যাগুলি হতে পারে নিম্নরূপ—

(ক) একঘেয়েমি, (খ) উৎসাহবোধের অভাব, (গ) নিষ্ক্রিয়তা, (ঘ) মানসিক অবসাদ, (ঙ) অনীহা (পড়তে অনাগ্রহ), (চ) একাকিত্ব বোধ, (ছ) পড়া অপ্রয়োজনীয় মনে হওয়া, (জ) মোবাইলের অনুচিত ব্যবহার, (ঝ) চোখের ক্লান্তি। ক্ষেত্র বিশেষে এমনতরো ছোটোখাটো আরও কোন সমস্যা তৈরি হওয়া খুব স্বাভাবিক। তবে শুধু শিক্ষার্থী নয় , শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ক্ষেত্রেও অনলাইনে দীর্ঘসময় শিক্ষাদানে সৃষ্টি হতে পারে নানা মানসিক অবস্থা—(ক) একঘেয়েমি/ক্লান্তি, (খ) শিথিলতা, (গ) আলস্য, (ঘ) অনাগ্রহ, (ঙ) গুরুত্বহীনতা, (চ) কর্তব্যে অবহেলা, (ছ) অবসাদ, (জ) অনলাইন বিষয়ক ব্যবহারিক কাজে অপটুতা ইত্যাদি। কেন এমন হচ্ছে! আসলে যেকোনো বড়ো পরিবর্তনের সময়ই এরকম একটা অবস্থা হয়। অনেকাংশেই এটি পরিবর্তন কাল (Transition Period) জনিত সমস্যা, তাও আবার এমন করে হঠাৎ। সমষ্টিগত শিক্ষা থেকে আমরা অনলাইনের শিক্ষায় প্রবেশ করেছি। কেউ ভাবেনি দিনের পর দিন এরকম একা থেকে সামনে পাশে কাউকে না দেখে, হাসি কথা হই- হুল্লোড়, চেঁচামেচি, রাগ-অনুরাগ, ঝগড়া-কৌতুক সবকিছু বর্জিত হয়ে পুরাণ কথার যেন এক নিঝুম পুরীতে রাজপুত্র/রাজকন্যা হয়ে যন্ত্রের সাহায্যে আপন কাজ (পড়াশোনা) সম্পন্ন করতে হবে। নিরুপায়, কিন্তু মনতো বোঝে না। সে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না বলেই এসব বিপত্তি-ভাব। সহপাঠী নেই, বন্ধু নেই, সহযোগী শুভার্থীও (শিক্ষক শিক্ষিকা) নেই। মনের কথা বলার জায়গা নেই, কারও কথা শোনারও সুযোগ নেই। কিন্তু মনের মধ্যে তো কত কথা, ইচ্ছা, অনুভূতি চাহিদা নিত্যই তৈরি হতে থাকে। পরিবারে পরিবেশের সীমাবদ্ধতার মধ্যে সব সুরাহার সুযোগ হয় না। তখন এসব চাপা পড়া অবদমিত ইচ্ছা, চাহিদা, অনুভূতি মনে এক বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি করে। কী করবে বুঝে উঠতে পারে না। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে মানসিক দ্বন্দ্ব (Conflict) । এখান থেকেই তৈরি হয় খিট্‌খিটে মেজাজ, অনীহা (আমার পড়তে ভাল লাগে না.....) অবসাদ, মনের অদ্ভুত সমস্ত আচরণ। এই সময় শিক্ষার্থীদের এমন একা হয়ে পড়ার ফলে আরও কিছু সুদূরপ্রসারী সমস্যা তৈরি হচ্ছে বা হতে পারে। তারা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। বই পড়ার প্রবণতা কমে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে নিজ স্বার্থ ছাড়া পরহিতে কাজ করার মানসিকতাই হয়তো তৈরি হবে না। এমন হলে 'সমাজ' শব্দটার অর্থ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে!

এ প্রসঙ্গে সমস্যার আর একটা বড়ো দিক রয়েছে। আমাদের প্রায় ৬৯ ভাগ মানুষ গ্রামাঞ্চলে থাকে। অনলাইনে ক্লাস প্রশ্নে তাদের অনেকের কাছেই হয়তো মোবাইল নেই, কোথাও নেটওয়ার্ক নেই আবার তা থাকলেও মোবাইলে অনলাইনের নানা পদ্ধতিতে অভিভাবক অভ্যস্ত নন। তাদেরও একটা প্রশিক্ষণ হলে ভালো হয়। কেননা শিশুদের অনলাইনে সহযোগিতা বাবা-মাকেই করতে হয়।

এমন আনাচে কানাচে বসে থাকা সমস্যার অভাব নেই। কিন্তু সমাধানের লক্ষ্য ও কেন্দ্রবিন্দু হতে হবে অবশ্যই শিক্ষার্থী; তাদের মন, মনের সাবলীল গতি, পঠন পাঠনে আকর্ষণ। বর্তমান পরিস্থিতিতে এর বড় দায়িত্বটা বর্তাবে শিক্ষক শিক্ষিকার উপরেই। একটা কথা এখানে নিঃসঙ্কোচে বলাই উচিত—শিক্ষক-শিক্ষিকা যদি সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী চিন্তা সম্পন্ন (Innovative) না হন তাহলে তাঁর পক্ষে অনলাইনেতো বটেই সাধারণ ক্লাস করানোও বেশ কঠিন। যা করা হবে তা হবে নিছক যান্ত্রিক। এখন প্রতিদিনের পাঠদানের মধ্যে চাই একটা পরিমিতি, অল্প পরিবেশন কিন্তু সার্থক। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্য থেকে বেশ কিছুটা স্বচ্ছন্দে নড়াচড়ার মত ফাঁকা জায়গা রাখা। আর সেখানেই তৈরি করতে হবে অনলাইনে পাঠদানের আকর্ষণের বিষয়, আনন্দ, কৌতূহল, মজার নিত্যনতুন পসরা তৈরি করতে হবে সেখানে।

কিছু নমুনা ঃ

(১) সব বিষয়ের মধ্যেই তৈরি করা যেতে পারে নানা পর্যায়ে মজার মজার ধাঁধাঁ (Puzzle)। খুঁজলে পরে অগুন্তি সংখ্যায় সংগ্রহ করা যেতে পারে।

(২) অঙ্কের জাদু/অঙ্কের মজা।

(৩) ছবি দেখে গল্প তৈরি করা।

(৪) ছোটো ছোটো প্রকল্প কাজ। যেমন—তোমার অঞ্চলে বর্ষার পরিবেশে কী কী পরিবর্তন দেখছ বা বর্ষায় আশপাশে কী ধরনের কীটপতঙ্গ, ক্ষুদ্র প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছে। লিখে এবং পারলে ছবি তুলে পাঠাও। বর্ষায় তোমার কী করতে, কী খেতে ভালো লাগে, তেমন কিছু করলে সংক্ষিপ্ত এক বিবরণ তৈরি করে পাঠাতে পার, ছবিও পাঠানো যেতে পারে।

(৫) শনিবারটা নানা ক্রিয়াত্মক, সৃজনাত্মক বিষয়ের জন্য রাখলে ভালো হয়। যেমন—শিশুসভা বা কিশোর সভা। গান, নাচ, কবিতা পাঠ (স্বরচিত হলে খুব ভালো), বাদ্যযন্ত্র, গল্পবলা, এককাভিনয় ইত্যাদি।

(৬) ভালো কোনো দৃশ্যের ছবি তুলে পাঠাতে বলা। নিজের আঁকা ছবি হলেতো অতি উত্তম।

(৭) চার পাঁচজন শিক্ষার্থীর গোষ্ঠী তৈরি করে দিয়ে (মাধ্যমিক স্তরে)

তাদের গোষ্ঠী ভিত্তিক কোন সমস্যা/কাজ দেওয়া, যেমন—করোনার মধ্যে তোমার অঞ্চলে মানুষের কী কী সমস্যা হচ্ছে। তারা পরস্পর ফোনে যোগাযোগ করে নানা সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বিষয় তৈরি করবে।

(৮) তোমার দৃষ্টিতে সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ খবর।

(৯) কিছু হাতের কাজের নমুনা ভিডিয়ো করে পাঠানো। কাগজ কাটা, কাগজের ফুল, নানা শিল্প কর্ম হতে পারে। শিক্ষার্থীরা তৈরি করে ছবি পাঠাবে।

(১০) মাঝে মাঝে এসমস্ত বিষয়ের একটা প্রতিযোগিতা হওয়া উচিত। পুরস্কার অবশ্যই রাখতে হবে। ভাল কাজগুলো সব শিক্ষার্থীদের জানালে সকলে উৎসাহিত হবে।

(১১) খেলা—ঘরে বসে খেলা, খেলতে খেলতে পড়া, খেলার মাধ্যমে শরীর চর্চা, নতুন খেলা উদ্ভাবন করা, সংগ্রহ করা।

(১২) শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পক্ষ থেকে বিদ্যালয় পরিবেশের নানা আঙ্গিকের বর্তমান ছবি পাঠানো যেতে পারে (এক একদিন এক একটা অংশ বা বিষয়)। তারা দেখবে এতদিনে তাদের বিদ্যালয় পরিবেশে কেমন পরিবর্তন এসেছে।

মাঝে মাঝে প্রাসঙ্গিক কোনো বই পড়তে, গান শুনতে, ছবি আঁকতে আগ্রহ করা। চোখকে বিশ্রাম দেওয়ার পদ্ধতি অবশ্যই সকলের সামনে তুলে ধরা উচিত। আসন, প্রাণায়াম, শরীরচর্চার বিষয়টিকেও যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া দরকার। এত সমস্ত কিছু অবশ্যই একদিনে নয়। মোটামুটি একটা সমানান্তর রেখে নিয়মিত পাঠালে নিত্য নতুনের স্বাদ পাওয়া যাবে। একটা পেলে ততক্ষণে অন্যটা পাবার জন্য আগ্রহ তৈরি হবে। আসল কথা, সবাই যদি নানা সৃজনশীল কাজে, আপন কাজে ব্যস্ত থাকে, আনন্দ খুঁজে পায় তবে আর সে সমস্ত সমস্যাগুলো কাছে ঘেঁষার সুযোগ পাবে না। শিক্ষক-শিক্ষাকাগণও সমানভাবে আনন্দ উপলব্ধি করবেন।

এসময় প্রতিটি শিক্ষার্থীর পরিবার হয়ে উঠেছে স্ব-নিয়ন্ত্রিত এক একটি ক্ষুদ্র বিদ্যালয়। তাকে সঠিক পথে নিত্য সচল রাখাই শিক্ষক শিক্ষিকার এখন প্রধান কাজ। আর এসব কাজে সফলতার মূলসূত্র হলো আনন্দ প্রাপ্তি। আনন্দ থেকেই আসে একাগ্রতা, পরবর্তীতে ধ্যান, মনোযোগিতা। ইষ্ট লাভে (লক্ষ্য প্রাপ্তি) কঠিন পথের যাত্রা শুরু হয় এখান থেকেই। অতএব—'আপন কাজে বিভোর হয়ে চল ছুটে চল উল্লাসে'।

স্মরণ

দেশমাতৃকার চরণে চুরকা মুর্মূর আত্মবলিদান

দেবপ্রসাদ মজুমদার

বলা হয় জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো। কর্মগুণেই মানুষ তার নশ্বর জীবনে শাশ্বত চিহ্ন রেখে যায়। আজ থেকে ৫১ বছর আগে সাঁওতাল পরিবারের এক অখ্যাত যুবক দেশ ও জাতির জন্য আত্মবলিদান দিয়ে যে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছিল, আজ তা আমাদের স্মরণ মনন করবার সময় এসেছে। আর তা যদি আমরা বিস্মৃত হই, গুরুত্ব না দিই তবে নিজেদের মনুষ্যত্বের উজ্জীবন যেমন স্তব্ধ হবে, তেমনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পথনির্দেশ করতেও আমরা ব্যর্থ হব।

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ২ জুলাই পূর্বতন পশ্চিম দিনাজপুর জেলার চকরাম প্রসাদ গ্রামে পিতা খেলারাম মুর্মূ ও মাতা সুমি হাঁসদার ঘরে জন্মলাভ করে যে ভূমিজ সন্তান, তার শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞান গরিমা সভ্য পৃথিবীর কাছে হয়ত উপস্থাপিত করবার মতো ছিল না। কিন্তু দেশ, জাতি ও নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তিনি যা করেছিলেন, এই একটি মাত্র শুভ কর্মের জন্য তিনি দেশপ্রেমিকদের অন্তরের মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছে। এই বীর সন্তান হলেন চুরকা মুর্মূ।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের বর্তমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছে। খানসেনারা ভারত সীমান্ত চককালু গ্রামে প্রবেশ করে BSF Camp দখল করবার চেষ্টা করছে। এই খবর জানতে পেরে চুরকা মুর্মূ দেশের ও জাতির চরম সংকট উপস্থিত জেনে সেই খবর পৌঁছে দেয় স্থানীয় BSF ক্যাম্পে। ক্যাম্পে তখন যথেষ্ট সংখ্যক জওয়ান ছিলেন না, তবু তাঁরা অগ্রসর হতে চাইলেন, কিন্তু তাদের গোলাবারুদ বহন করবার জন্য কোনো লোক ছিল না। এই কথা শুনেই চুরকা ও তার ৪ জন সঙ্গী গোলা বারুদের বাক্স নিয়ে অগ্রসর হলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য যথেষ্ট সংখ্যক জওয়ান না থাকায় তাঁরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। গোলাবারুদ শত্রুদের হাতে পড়লে সর্বনাশ হবে চিন্তা করে চুরকা কোনোক্রমে পাটখেতের পাশ দিয়ে এক পুকুরে গোলার বাক্সটা ফেলবার চেষ্টা করলেন, আর তা দেখে ফেলে খানসেনারা গুলি করে তাঁর শরীর ঝাঁঝরা করে দেয়। কিন্তু সেই গোলাবারুদের বাক্সটি পুকুরের জলে ফেলতে সক্ষম হলেন।

ভাবুন, দেশ জাতির জন্য মাত্র উচ্চমাধ্যমিক পাশ এক তরুণের এমন আত্মত্যাগ কয়জনের পক্ষে সম্ভব? কয়জনের হৃদয় এত উদার, মহৎ ও আত্মবলিদানে তৎপর হয়? এই প্রেরণা চুরকা পেয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখায়। তিনি তাঁর গ্রামের শাখার মুখ্যশিক্ষক ছিলেন। আসুন, আজ সেই মহাপ্রাণকে স্মরণ করে সামান্যতম ঋণ শোধের চেষ্টা করি।

(১৮ আগস্ট চুরকা মুর্মূর বলিদান দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

শেকড়ের সন্ধানে

অজয় সরকার

লন্ডনের প্রবাসী পাকিস্তানিরা চীনা দূতাবাসের সামনে দাড়িয়ে চীনের অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক সাম্রাজ্যবাদের প্রতিবাদ করেছেন। বেশ বড় হেডলাইন হয়েছে দেশি বিদেশি সংবাদমাধ্যমে। অদ্ভুত বিষয় যে, প্রতিবাদের ভাষা রূপে তারা ভারতের রাষ্ট্রীয় সংগীত বন্দে মাতরম্ গাইলেন। এই ধরনের দৃশ্য শুধু বেখাপ্পাই নয় অকল্পনীয়ও বটে। যাই হোক, বন্দে মাতরম্ কেন পাকিস্তানিরা গাইলেন, তা নিয়ে আলোচনা করার আগে, চীনাদের বিরুদ্ধে লন্ডন প্রবাসী পাকিস্তানিদের এতো রাগ কেন, তা আমরা একটু বুঝতে চেষ্টা করবো।

প্রথমত, সারা পৃথিবীতে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে দেওয়ার দায়ভাগ চীন এড়াতে পারে না। যদিও চীন তার দোষ অস্বীকার করেছে। প্রায় সব সাক্ষ্য প্রমাণ চীনাদের বিরুদ্ধে গেছে এবং তারা অপরাধের দায়ভাগ থেকে ছাড় পেতে না। চীন যে কর্তৃত্ব লাভের বা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য এইসব অপরাধ করেছে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং সারা বিশ্বের মানবিক কণ্ঠের সঙ্গে পাকিস্তানের সচেতন প্রবাসীরা যে সুর মেলাবেন, তাতে আশ্চর্য কী? মনে রাখা দরকার যে, ওরা ওদের দেশকে যে-কোনো দেশপ্রেমিকের মতই ভালোবাসেন। ঠিক এই কারণেই তারা আজ চীন বিরোধিতায় নেমেছেন।

দ্বিতীয়ত, China Pakistan Economic Corridor (C.P.E.C) যে প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের জনগণকে চীনের অর্থনৈতিক ক্রীতদাসে পরিবর্তিত করতে চলেছে, তা প্রায় সব পাকিস্তানি বুঝে গেছেন। কিন্তু দেশের শাসকদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে এরা মত প্রকাশ করতে সাহস পান না। এটা ঠিক যে গুটিকয়েক সামরিক কর্তাব্যক্তির CPEC দিয়ে বেশ লাভ হচ্ছে, কিন্তু আম নাগরিকরা আগামীদিনে নিঃস্ব যে হতে চলেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পাকিস্তানি একটি সংস্থা জানিয়েছে যে, ২০২১ থেকে চীনকে ঋণ পরিশোধ করতে যে অর্থ দিতে হবে, তার জন্য পাকিস্তানকে নতুন করে বিদেশি ঋণ নিতে হবে। পাকিস্তান FATF-এর Grey List -এর তালিকাভুক্ত হওয়ায়, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থা থেকে নতুন ঋণ পাওয়া বড়ো কঠিন।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক শোষণের পরিণতির ভয়াবহ পরিণাম পাকিস্তানের সমাজ জীবনে ইতিমধ্যেই প্রতিফলিত হতে শুরু করেছে। পাকিস্তানের এক ব্যাপক অংশের পরিবারের মেয়েদের চীনা পুরুষরা বিয়ে করে চীনে নিয়ে যাচ্ছে। চীনা পাত্র ও পাকিস্তানি পাত্রীর নিকাহ পাকিস্তানের গ্রামের এক পরিচিত দৃশ্য। এই মেয়েদের বিয়ে করে চীনে নিয়ে গিয়ে চড়া দামে পতিতালয়ে বিক্রয় করা চীনাদের এক লাভজনক ব্যবসা। অনুমান করা হচ্ছে যে, বিশাল চীন দেশের এমন কোন পতিতালয় নেই, যেখানে পাকিস্তানি মেয়ে পাওয়া যায় না।

নিঃসন্দেহে, পাকিস্তানের প্রবাসীরা ভারতীয় প্রবাসীদের মতোই শিক্ষিত, সচেতন, অর্থবান এবং নিজের দেশের উন্নতিতে বেশ গর্ববোধ করেন। পাকিস্তানের এই হতদশা তাদের মনে গভীর কষ্ট দিয়েছে। তাই, তারা চীনা দূতাবাসের সামনে চীনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। এটা সত্যি যে আমাদের দেশের কয়েকটা হতচ্ছাড়া কমিউনিস্ট এবং বেহুদা কংগ্রেসি ছাড়া সারা পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যারা আজ চীনের বিরদ্ধে নয়। সরকারি ক্ষমতায় না থাকার ফলে এই দলগুলোর (কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট) অবস্থা ডাঙায় তোলা পুঁটি মাছের মতো। যে কোনো ভাবে এরা ক্ষমতা ফিরে পেতে চায়। এজন্য এরা খুব ছটপট করছে। ভারতের দেশপ্রেমিক মানুষ যেহেতু চীনের বিরুদ্ধে, তাই কমিউনিস্ট ও কংগ্রেসিরা চীনের পক্ষে। এদের এই বোধটুকুও নেই যে এর ফলে দেশের সাধারণ মানুষ এদের বিপক্ষে চলে যাবেন। পাকিস্তানিরা আমাদের দেশের বেহুদাগুলোর মতো নয়। ওরা ওদের দেশের স্বার্থের প্রশ্নে দলমত নির্বিশেষে একজোট। এটা খুব ভালো।

সে যাই হোক, পাকিস্তানি প্রবাসীরা চীনের বিরুদ্ধে সঙ্গতভাবেই বিক্ষোভ দেখাতে পারেন, দোষ নেই। কিন্তু এরা বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দিয়েছেন কেন?

এদেশের যারা মুসলমানয় নেতা (সবাই নয়) তারা মনে করেন যে ইসলামে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি কোনো মুসলনাম মাথা নত করতে পারে না। বন্দে মাতরম্ সংগীতের মধ্যে যেহেতু দেশমাতৃকাকে দেবীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, তাই আল্লাহর কোনো বান্দার পক্ষে বমোতরম্ সংগীত গাওয়া গুণাহ্। তাই, মুসলমানরা ১৯৩৭ সালে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে বন্দে মাতরম্ সংগীতের উপর প্রথম আক্রমণ করে। সেদিন মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির চাপের কাছে কংগ্রেস অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেছিল। ভারতবর্ষের দেশপ্রেমিকদের কাছে সেটা ছিল এক বেদনাদায়ক দিন। হাজার হাজার দেশপ্রেমিককে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা এই অমর রাষ্ট্রীয় সংগীতের পাঁচটি স্তবকের মধ্যে শেষ তিনটি স্তবক কেটে বাদ দেওয়া হয়, কারণ ওই স্তবকগুলো তাদের মতে সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট। আত্মসমর্পণের পরেও কি কংগ্রেস দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করতে পেরেছিল? হিংস্র নেকড়েকে এক টুকরো মাংস ছুড়ে দিয়ে কি নেকড়েকে অহিংসক বানানো যায়? নেকড়েকে সুন্দরভাবে প্রতিহত করার

ওষুধ বা বিধান আমাদের পূর্বপুরুষেরা আমাদের দিয়ে গেছেন। আমরা বিস্মৃত হয়েছি। মনে রাখা দরকার, যেসব প্রবাসী পাকিস্তানি চীনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন, তারা সচেতন ভাবেই 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিয়েছেন। যে বন্দে মাতরম্ ইসলাম বিরোধী, তাকে পাকিস্তানিরা আকড়ে ধরতে চাইছেন কেন? অনেকে অনেক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তবে প্রণিধানযোগ্য যে মতগুলো পাওয়া গেছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

প্রথমত, এটা ঠিক যে পাকিস্তানে বসবাসকারী সাধারণ মুসলমানদের ভাবনাচিন্তা এখনো মধ্য যুগে থেকে গেছে। ওরা আরব্যরজনীর উপন্যাসের কল্পকাহিনিতে বিশ্বাস রেখে এখনো এই ভাবনায় সুখ পান যে তারা ভারতবর্ষে দার-উল-হার্ব প্রতিষ্ঠা করবেন। অন্যদিকে, শিক্ষিত, সচেতন প্রবাসী মুসলমানেরা তাদের জীবনের অভিজ্ঞতায় এই উপলব্ধিতে এসেছেন যে ইসলাম কখনো রাষ্ট্রীয় ঐক্যের ভিত্তি হতে পারে না। যদি তাই হতো তাহলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ ৫৭টি দেশের আলাদা আলাদা অস্তিত্ব তৈরি হতো না। এমনকী, ১৯৪৭ সালে ইসলামিক মতবাদের উপর ভিত্তি করে ভারত ভাগ করে সৃষ্ট পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে গিয়ে ইসলামিক বাংলাদেশ তৈরি হতো না। এটা কে অস্বীকার করবে যে এখনও এই পৃথিবীতে যে হানাহানি, রক্তপাত, তার জ্বলন্ত উদাহরণ মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামি দেশ সমূহ। এটা পরিহাস যে অনেক ভাষ্যকার 'ইসলাম' শব্দের অর্থগত ব্যাখ্যা করেছেন 'শান্তি'।

দ্বিতীয়ত, ধর্ম শব্দের সমার্থক যখনই Religion বলে ধরে নেওয়া হয়, তখনই বিকৃত ভাবনার জন্ম হয়। ভারতবর্ষের ঐতিহ্য ও পরম্পরা যদি একটু বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে আমরা দেখি, তাহলে দেখবো যে অতীত ভারতে Political dispension গণতন্ত্র বা রাজতন্ত্র, যাই হোক না কেন শাসনকার্য পরিচালিত হতো ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা। ধর্মীয় অনুশাসন থেকে যখনই শাসক বিচ্যুত হয়েছে, তখনই অশান্তি, যুদ্ধবিগ্রহে দেশ জড়িয়ে পড়েছে। ভারতীয় সমাজজীবনের প্রেক্ষিতে ধর্ম বলতে অতীতের কোনো মতবাদকে বুঝানো হয়নি, আজও তা বুঝানো হয় না। ভারতীয় সমাজে জীবনে ধর্ম হলো কতকগুলো নিয়ম, যা নৈতিক ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। সময়ের অমোঘ নিয়মের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সমাজের মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে, নৈতিক ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত নিয়মগুলোও ঠিক সেইভাবে নিজেদেরকে সমাজের দাবির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। এর ফলে আমাদের দেশে ধর্ম হয়ে উঠেছে মানবকল্যাণকর ও বিজ্ঞানমুখী। অতীতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য অবশ্যই একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, কিন্তু আমরা একটিও উদাহরণ পাই না যেখানে যুদ্ধের কারণ ছিল ধর্মীয় মতবাদ। বরঞ্চ, নৈতিক ন্যায়ের (ধর্মের) পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলে শাসকদের যে অশেষ দুর্গতি হয়েছে, তার অসংখ্য উদাহরণ আমরা পাই।

Abrahamic religion -গুলোর মধ্যে ইসলাম ও খ্রিস্টধর্ম প্রধান। উভয় মতবাদই নিজেদেরকে অপর যে কোনো মতবাদ বা ধর্মাবলম্বীদের চেয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করে। এই যে কে বড়ো, আর কে ছোটো, তা নিয়ে তো তিনশো বছর ধরে জিহাদ ও ক্রুসেড চললো। জেরুজালেমের উপর দখলদারি নিয়ে যেসব কথা বলা হয়, তা তো বাহ্য। মূল লড়াই তো শ্রেষ্ঠত্ব জাহিরের লড়াই। সিয়া সুন্নির লড়াইতে সারা পৃথিবী আজ ভয়ে ভয়ে কম্পমান। এতো রক্তপাত ও বারুদের গন্ধ, সবই ক্ষমতা দখলের লড়াই; আধ্যাত্মিকতা নিয়ে নয়। আজকাল Secular বা ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে খুব কথা হচ্ছে। সেটা কী? সেটা হলো খ্রিস্টান দেশে রাজার উপর চার্চের কতটুকু প্রভুত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব থাকবে, তা নিয়ে রক্তক্ষয়ী লড়াই। গালভরা নাম দেওয়া হল Reformation Movement। অন্যদিকে, ভারতবর্ষের রাজারা কখনো একাধারে ধর্মগুরু ও রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার চেষ্টা করেননি, কারণ সমাজ ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত ছিল বলে কেউ তার অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার সাহস দেখাননি। ফলে, পোপ ও খলিফাকে নিয়ে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের যে সমস্যায় পড়তে হয়েছে, ভারতবর্ষে সেই সমস্যার উদ্ভব কখনো হয়নি। আমি একথা বলছি না যে হিন্দু সমাজের মধ্যে মতবিভেদ ছিল না। অবশ্যই ছিল। সে তো সবার মধ্যেই রয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে তো ৭৪টি ভাগ এবং এরা পরস্পরের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত। হিন্দুদের মধ্যে মতপার্থক্য অবশ্যই ছিল, কিন্তু তা নিয়ে জিহাদ বা ক্রুসেড হয়নি বা Reformation Movement ও হয়নি।

কেন হয়নি? কারণ, সুদূর অতীত থেকে ভারতীয় সমাজ রাষ্ট্রকে কখনোই স্রেফ ভৌগোলিক এলাকা, নির্দিষ্ট জনসংখ্যা, ভাষা, সার্বভৌমত্ব ইত্যাদি দ্বারা সংজ্ঞায়িত করেনি। আমাদের সমাজ রাষ্ট্রের মধ্যে এক জীবন্ত সত্ত্বাকে দেখেছে। 'কঙ্করে কঙ্করে শঙ্কর' বলা হয়, তা তো সেই অনাদি ভাবনারই প্রতিফলন। ভারতরাষ্ট্রকে মাতৃভূমি রূপে কল্পনা করা, মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ী রূপে দেখা, ভারতীয় সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে আমাদের জীবনে সুপ্রোথিত। জন্মভূমিকে জননীর সঙ্গে তুলনা তো শ্রীরামচন্দ্রের সময় থেকে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্ সংগীত তো ভারতীয় সমাজ জীবনের সেই শাশ্বত চেতনারই ধারাবাহিকতা। প্রবাসী পাকিস্তানিদের নিশ্চিত ভাবেই ক্ষোভ তাদের দেশের সরকারের বিরুদ্ধে, চীনের বিরুদ্ধে । কিন্তু, তারা প্রতিবাদের ভাষা হিসাবে যখন বন্দে মাতরম্-কে বেছে নেন, তখন মনে হয়, তারা যেন সচেতনভাবেই তাদের ভুলে ভরা অতীতের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছেন। এটা কি অস্বীকার করা যায় যে পাকিস্তানের মুসলমানেরা হিন্দুদেরই সন্তান? কচুরিপানার জীবন কাঙ্ক্ষিত নয়। তাই হয়তো পাকিস্তানের বিদগ্ধ প্রবাসী সমাজ লন্ডনের পথে শেকড়ের খোঁজ পেতে চাইছেন। ■

মুসলিম রাজনৈতিক নেতাদের গগনচুম্বি স্পর্ধা

১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার আগে মুসলিম লিগ নেতা জিন্নার দাবির কাছে নতি স্বীকার করে দেশভাগ করে ভারতের মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান গঠনের দাবি স্বীকার করে নিয়েছিলেন তৎকালীন জাতীয় কংগেসের নেতৃবৃন্দ। সব কিছু শুনে গান্ধীজী বলেছিলেন দেশভাগ হলে তা হবে তাঁর মৃতদেহের ওপর দিয়ে। পরবর্তীকালে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ গান্ধীজী স্বীকার করে নিয়েছিলেন কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে লোক বিনিময় তিনি স্বীকার করলেন না। ফলে ভারত ভূখণ্ডের মুসলমানরা যে যেখানে যেমন ছিল, তেমনই থেকে গেল। শুধুমাত্র এই নয়, তাদের সুরক্ষার জন্য তৈরি হলো, মুসলিম পার্সোনাল ল' আর হিন্দুদের জন্য তৈরি হলো হিন্দু কোড বিল। মুসলিম পার্সোনাল ল'-এর বলে বলীয়ান হয়ে মুসলমানরা একসঙ্গে চারটি নিকা করে চার বিবি নিয়ে ঘর করতে এবং যথেচ্ছ সন্তান উৎপাদন করতে পারবে।

অন্যদিকে কোনও হিন্দু একটির বেশি বিবাহ করলে কোনও মুসলমান পুলিশ অফিসার যার ঘরে তিনটি বিবি আছে সেও ওই হিন্দুকে দুটি বিবাহ করার অপরাধে গ্রেপ্তার করতে পারবে। তারপর ওই হিন্দুকে বিচারের জন্য আদালতে আনা হলে কোনও মুসলমান বিচারপতি যার ঘরে চারটি বিবি আছে তিনিও ওই হিন্দুকে দুটি বিবাহ করার অপরাধে সাজা দিতে পারবেন। দেশভাগের সময় ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল সাড়ে তিন কোটি। বর্তমানে চারটি বিবাহ এবং যথেচ্ছ সন্তান উৎপাদনের কারণে দেশে মুসলমানদের সংখ্যা ২০ কোটি বা ততোধিক। এই পার্সোনাল ল'-এর বলে বীলয়ান হয়ে মৌলানা ওবেদুল্লা খান আজমি পার্লামেন্টে ভাষণ দিয়েছিলেন, 'মুসলমান ভাইসব! আপনারা ঘাবড়াবেন না। ইসলাম এখনও জীবিত। এখনও আমাদের কোরান আছে। গোপনে মুচকি হাসি-হাসা এই কাফেররা কী ভেবেছে? শেষ লড়াই আমরা লড়ব কারবালার প্রান্তরে। আর ততদিনই আমরা এই দেশের আইন মানব— যতদিন সেগুলি আমাদের বাঁচাবে। কোনও কোর্টের ধার ধারি না। ছাড় তোমার হাইকোর্ট! ছাড় তোমার সুপ্রিম কোর্ট! হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টকেও জুতোর ডগায় ঠিক করব যদি তা আমাদের ব্যক্তিগত আইন (মুসলিম পার্সোনাল ল')-এ হস্তক্ষেপ করে (১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মার্চ পার্লামেন্টের রাজ্যসভার দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের প্রাক্কালের ভাষণ)। এরপর ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে ভারতের সংবিধান ৪২তম সংশোধনের মাধ্যমে ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা করা হলো ১৯৭৬ সালে।

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার,
চন্দননগর।

করোনায় করণীয়

২০২০ সালে একের পর এক ভয়ানক পরিস্থিতির শিকার হতে হচ্ছে মানব সভ্যতাকে। করোনা ভাইরাসের আক্রমণ, আমফান ঝড়, কালবৈশাখীর দাপট, ভূমিকম্প, চীন-ভারত সীমান্ত সংঘাত-সহ নানা ঘটনায় ২০২০ সালকে অভিশপ্ত বছর বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। তবে সবচেয়ে আতঙ্কিত ও উদ্বেগের বিষয় অবশ্যই করোনা সংক্রমণ। এই মারণ ভাইরাসের আক্রমণের হার ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এই কোভিড-১৯ সংক্রমণের জন্য রাজ্য তথা দেশকে বিপদের মধ্যে পড়তে হয়েছে। লাগাতার লকডাউনের ফলে হাজার হাজার মানুষের কর্মহীন। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় প্রায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সারা দেশে। ফলে দেশের অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিতে বাধ্য। তবুও এই কঠিন পরিস্থিতিতে দেশের জাতীয়তাবাদী সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপে আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয়নি দেশকে। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই মারণ ভাইরাসের প্রতিরোধে আমরা কতটা সফল? এর থেকে মানুষ কবে মুক্তি পাবে? বলা যেতে পারে বর্তমান পরিস্থিতিতে এই সংক্রমণ রোগকে কিছুটা হলেও রোধ করা সম্ভব হয়েছে। আক্রান্ত মানুষের সুস্থতার হার অনেক বেড়েছে। কিন্তু এই কঠিন রোগের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ভূমিকা কী? আক্রান্ত রোগীকে কিন্তু অনেক সময়ই অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা, অবহেলার শিকার হতে হয়েছে। রোগীকে সামাজিক বয়কট করা হয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে যে আধুনিক যুগেও এরকম ঘৃণ্য মানসিকতার শিকার হতে হচ্ছে একজন রোগাক্রান্ত মানুষকে। বর্তমান পরিস্থিতিতে যে কেউ এই সংক্রমণের শিকার হতে পারেন।

চিঠিপত্র

সংক্রমিত রোগীর মনোবল চাঙ্গা রাখা দরকার। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে আমাদের লড়াই রোগের বিরুদ্ধে, রোগীর বিরুদ্ধে নয়। এই মুহূর্তে প্রয়োজন রোগ বা সংক্রমণ প্রতিরোধ করা। কিন্তু অসহিষ্ণুতা, অবৈজ্ঞানিক মনোভাব ও যুক্তিবোধের অভাব থেকেই কিছু মানুষ একজন সংক্রমিত অসহায় মানুষকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। সংকটকালে মানুষ কী একাত্ম হয়? সাধারণত দেখা যায় যে কোনো মহামারী দেখা দেওয়ার প্রথম দিকে মানুষ সহযোগিতা পরায়ণ থাকলেও পরে মহামারীর প্রকোপ বাড়লে মানুষের আচরণ বদলে গিয়ে ভালোবাসার বাঁধনকে ছিন্ন করে ফেলে। মানুষ তখন ভয়ে অমানবিক আচরণ করে। এরকম উদাহরণও আছে যে আক্রান্ত রোগীকে ঘরে ঢুকতে না দেওয়া, সংক্রমিত রোগীর মৃতদেহ সৎকার না করা এধরনের অমানবিক আচরণকে সমাজের কলঙ্কিত ঘটনার অন্যতম হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। আবার অনেকে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করেছেন যা মানবাধিকারের চরম অবমাননা। একথা ঠিক যে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের ব্যাপক সংগ্রমণ বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো মানবিক বিপর্যয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এটিকে বৈশ্বিক মহামারী হিসেবে ঘোষণা করেছে। এই অবস্থায় সংক্রামক ব্যক্তির সংকটকালীন অবস্থায় সামাজিক দূরত্ব মেনে তাকে সহযোগিতা করা দরকার। মানুষ যেন মনুষত্বহীন না হয়ে পড়ে। 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা সকলের তবে'— একথা মনে রাখা দরকার। মনে রাখতে হবে যে, সংক্রমিত ব্যক্তিরা কিন্তু অচ্ছুত নন। সামাজিক রীতিনীতি মেনেই এই বৈশ্বিক বিপর্যয়কে মোকাবিলা করা দরকার। অবশ্য এই কঠিন সময়ে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, সহৃদয় ব্যক্তি যারা এগিয়ে এসেছেন তাদের সাধুবাদ জানাতে হয়। জাতীয় এই মানবিক দুর্যোগ ঠেকাতে অবশেষে সকলে ঘরে থাকবো, স্বাস্থ্যবিধি এবং সামাজিক দূরত্ব মেনে চলবো। কিন্তু সেই সঙ্গে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সহায়তা

করব এই মানসিকতা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

—**সমীর কুমার দাস,**
দ্বারহাট্টা, হুগলি।

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন সব সীমাকে টপকে গেল

কথায় আছে 'যার যাহা অভ্যাস কভু নাহি যায়/ঢুলির যদি ঢোল না থাকে/ বসে বসে পেট বাজায়'। যতই বাংলাদেশ সরকার ভারতের বন্ধু হোক না কেন, হিন্দু নির্যাতন এদের মজ্জাগত। জামাত নেতারা আওয়ামি লিগের বন্ধু ও সরকারের সহযোগী। এরা কখনোই চায় না কথা কাহিনি, গল্প, উপন্যাসে হিন্দুর নাম থাক। এমনকী এই জামাতিরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহু গানেও আপত্তি জানিয়েছে। এখন নামতার বইতে 'এই একে চন্দ্র, দুই-এ পক্ষ, তার বদলে হয়েছে— একে আল্লা, পাঁচে নামাজ ইত্যাদি। জামাতিরা কোনো জিনিসেই হিন্দুর রেখা থাক, এটা চায় না। পুস্তকে 'হিন্দু-মুসলমান' কথাটাকে কেটে দিয়ে করেছে 'মুসলমান-হিন্দু', আবার হিন্দুর বদলে করেছে 'অমুসলমান'। তাতে হিন্দুর নামটা আর মুখে আনতে হবে না। স্বামীজীর কথায় 'এক ঘণ্টা আগে যে হিন্দু ছিল, ধর্মান্তরের পর সে হবে হিন্দুর বড়ো শত্রু'। এমনকী ইলিশ মাছকে অনেকে হিন্দু মাছ মনে করে খেতে আপত্তি জানিয়েছে। এসব তো পুরানো কথা। বর্তমানে এই করোনা আবহে ওখানকার লোকেরা যা শুরু করেছে সেটা ভাবনারও অতীত। হিন্দু করোনা নারীকে হাসপাতালে অসুস্থ অবস্থায় বলাৎকার করতেও ছাড়েনি। খবরে দেখতে পেলাম, হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন বর্তমানে হিন্দুদের জমি দখল, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, হত্যা ও হত্যার ষড়যন্ত্র কোনো কিছুই বাদ যাচ্ছে না। এগুলি জলখাবারে পরিণত হয়েছে। এদিকে ভারতে চলে আসার হুমকি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে দাঁড়িয়েছে। এ সমস্ত কিছুই পূর্বের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কোথায় গতি শ্লথ হবে সেখানে সবকিছুই দীর্ঘ হতে শুরু করেছে। গোবিন্দবাবু জানিয়েছেন এই ৬ মাসে ৭২ জন হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছে। নথিভুক্ত ছাড়া আরও কত ঘটনা ঘটেছে তার ইয়ত্তা নেই। এদিকে ২৪৮৬ জনকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে বাংলাদেশ হিন্দু শূন্য হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা।

—**স্বপন কুমার ভৌমিক,**
শান্তিপুর, নদীয়া।

করোনা সংক্রমণ প্রসঙ্গ

কোভিড সংক্রমণের হার ও মৃত্যুর সংখ্যাটা প্রথমদিকে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ভারতে যখন অনেক কম ছিল তখন থেকেই বলা হচ্ছিল জুলাই মাসে এই সংখ্যাটা ভয়াবহ আকার নেবে। এটা ঠিক, হঠাৎ এমন পরিস্থিতির জন্য রাতারাতির প্রস্তুত থাকাটা সম্ভব ছিল না। চিকিৎসক থেকে সর্ব স্তরের স্বাস্থ্যকর্মীর সংক্রমণজনিত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার কাজটা দ্রুততার সঙ্গে করা কঠিন হলেও কিছুটা হলেও আজ করা গেছে। এর মধ্যে আমফান অভিশাপ হয়ে আসায় রাজ্য প্রশাসনের পক্ষে কাজটা আরো কঠিন হয়েছে।

একদিকে এই আপৎকালীন সময়ে ভিন রাজ্য থেকে আসা শতাধিক সুশিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত নার্সদের কাজ ছেড়ে চলে যাওয়া ও রাজ্যে পর্যাপ্ত নার্স না থাকা, সংক্রমণ দূরবর্তী জেলাগুলিতে ছড়িয়ে পড়া ও সর্বোপরি রাজ্যে হাসপাতাল বেডের অপ্রতুলতা সমস্যাটিকে ক্রমশ ভয়াবহ চেহারা নিচ্ছে। কেবল দারিদ্র অসহায়রাই নয়, মধ্যবিত্ত, ধনী এমনকী ক্ষমতাবানদেরও হাসপাতালের দুয়ারে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে, ঘটছে একের পর এক মৃত্যুও। এই অবস্থায় রাজ্যের কাণ্ডারির মুখ থেকে সাতদিনে নার্স তৈরির মতো দায়িত্বহীন উদ্ভট প্রস্তাব আতঙ্কিত রাজ্যবাসীর কাছে নিষ্ঠুর রসিকতা হয়ে দেখা দিচ্ছে। যে জরুরি উদ্যোগটা রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নেওয়ার দরকার ছিল সেই satellite halth facility centre তৈরির বিষয়টা ভাবনাতেই আসেনি। এই কাজে কেরল, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ওড়িশার মতো রাজ্যগুলি অনেক আগেই হাত দেওয়ায় ফলও পেয়েছে। অন্যদিকে এখানে সেটা এখনে তেমন ভাবে শুরুই হয়নি বলা চলে। বরাহনগর পৌরাঞ্চলের একটা গোটা ওয়ার্ড জুড়ে অবস্থান করা একদা কেন্দ্রীয় সরকার অধিগৃহীত বেঙ্গল ইমিউনিটির মতো একদা গর্বের বিশাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠানটি সবরকম পরিকাঠামো নিয়ে গত বিশ বছর বন্ধ রেখে অভয়ারণ্য বানানো হয়েছে।

কেবল কলকাতা শহরেই কয়েকশো কর্পোরেশন পরিচালিত প্রাথমিক, এমনকী উচ্চবিদ্যালয় বন্ধ। রাজ্য জুড়ে এমন পরিত্যক্ত ভবন কয়েক রাজার। আরও কতো বড়ো সর্বনাশা আতঙ্ক গ্রাস করলে এইসব সম্ভাবনাগুলির সদ্ব্যবহারের ভাবনা যুদ্ধকালীন গুরুত্ব পাবে এ প্রশ্ন প্রতিটি আতঙ্কিত রাজ্যবাসীর। স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে পুলিশ কর্মীদের জন্য এমন ব্যবস্থা সাধু উদ্যোগ সন্দেহ নেই, কিন্তু সারা রাজ্যে এমনটা প্রয়োজন।

ইন্দুভূষণ যখন এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ছিলেন তখন তিনি লক্ষ্য করেছিলেন পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য এডিবি ঋণের বিষয়ে কী ভীষণ মনযোগী।

একাধারে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা ও স্বাস্থ্যবিমার সুষম প্রয়োগে আজ কেবল চীনই নয়, ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়ার মতো ছোটো দেশগুলোও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সেখানে জাতীয় স্তরে আন্তর্জাতিক ঋণ জনস্বাস্থ্যে যথাযথ না ব্যবহার না করতে পারার মতো আয়ুষ্মান যোজনার সুযোগ হারানোর মতো satellite halth facility centre গড়তে না পারাটাও রাজ্যস্তরে ততোটাই ইচ্ছাকৃত অপরাধ হিসেবে আগামীদিনে গণ্য হবে।

—**কুণাল চট্টোপাধ্যায়,** কলকাতা।

৭৩তম বর্ষ পদার্পণে স্বস্তিকার শুভেচ্ছা

শুভ জন্মাষ্টমী তিথিতে স্বস্তিকা ৭৩তম বর্ষে পদার্পণ করল। এই উপলক্ষ্যে স্বস্তিকার সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক, গ্রাহক, প্রচার প্রতিনিধি, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। —**সম্পাদক, স্বস্তিকা**